সাপ্তাহিক
# আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ১৯-২০
বার : সোমবার

০৬ ফেব্রুয়ারি- ২০২৩ ঈসায়ী
২৩ মাঘ- ১৪২৯ বাংলা
১৪ রজব- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

**সাপ্তাহিক আরাফাত**
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সম্পাদক | : | ০১৭৬১৮৯৭০৭৬ | বিপণন অফিসার | : | ০১৯৩৩৩৫৫৯১০ |
| সহযোগী সম্পাদক | : | ০১৭১৬৯০৬৪৮৭ | কম্পিউটার বিভাগ | : | ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭ |
| ব্যবস্থাপক | : | ০১৯৩৩৩৫৫৯০১ | টেলিফোন | : | ০২-৭৫৪২৪৩৪ |

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين


**গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)**

| দেশ | বার্ষিক | সান্মাসিক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৩৫০/- |
| দক্ষিণ এশিয়া | ২৮ U.S. ডলার | ১৪ U.S. ডলার |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| মধ্যপ্রাচ্য | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ | ৫০ U.S. ডলার | ২৬ U.S. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ U.S. ডলার | ২০ U.S. ডলার |

**“সাপ্তাহিক আরাফাত”**

**ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**

**বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)**

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

**“সাপ্তাহিক আরাফাত”**

**অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

## সূচিপত্র


- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল-কুরআনের জ্যোতি** ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **শিশু শিক্ষা : পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি**
    মো. আব্দুল মালেক মাদানী- ০৫
- **প্রবন্ধ :**
  - **নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ৭
  - **মি'রাজ : একটি পর্যালোচনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ১০
  - **মৃত্যুর পরে আত্মার ঠাঁই কোথায়?**
    ডা. সুলতান আহমদ- ১৪
  - **সন্তান লালন-পালনে বাবা-মায়ের করণীয়**
    মো. আরিফুর রহমান- ১৬
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **গাভীর একটুকরো গোশ্‌তে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের এক বিস্ময়কর ঘটনা!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ২১
- **ভ্রমণবৃত্তান্ত :**
  - **এই সেই বিলাত**
    প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ২৩
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৭
- **সমাজচিন্তা :**
  - **ভ্যালেন্টাইনস ডে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস**
    মাক্বসুদুর রহমান- ২৯
- **মহিলাজগৎ :**
  - **ইসলাম নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে**
    শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী- ৩২
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - **সর্বপ্রাচীন গৃহ কাবার ইতিকথা**
    মুহাম্মদ আব্দুস শাকুর- ৩৪
- **বিস্ময়-বৈচিত্র্য :**
  - **দেহকোষ : মানবদেহের মৌচাক**
    মো. হারুনুর রশীদ- ৩৫
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৮
- **শুব্বান সংবাদ** ৩৯
- **স্বাস্থ্য ও সচেতনতা** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৪
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

# আহলে হাদীসের রাজনৈতিক দর্শন

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মানুষের ঈমান-আক্বীদাহ্ ও আমলের সংস্কার, সংশোধন এবং দাওয়াত-ই আহলে হাদীসদের মূল রাজনৈতিক দর্শন। এছাড়া তাদের অন্য কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। তাঁরা মুসলিম শাসকের বৈধ কর্ম-কাণ্ডের সমর্থন ও আনুগত্য করেন। কোনো বিষয়ে শাসক কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা সংশোধনের জন্য শাসককে উপদেশ দেওয়া এবং হেদায়াতের দু'আ করাকে নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। শাসক প্রকাশ্য কুফুরী করলে কিংবা সালাত (নামায) আদায়ে বাধা প্রদান করলে সামর্থ্য অনুযায়ী শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আহলে হাদীসগণ জরুরি মনে করেন।

এমনকি মুসলিম অত্যাচারি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করতে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমার পর তোমাদের মাঝে এমন কিছু শাসক আসবে। তারা এমন কিছু কাজ করবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে। অতএব, যে অস্বীকার করবে সে দায়মুক্ত হবে এবং যে এটা অপছন্দ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে তা খুশি মনে মেনে নেবে ও প্রচার করবে! তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের সাথে লড়াই করবো না? তিনি বলেন : না, যে পর্যন্ত সালাত আদায় করে"– (আত্ তিরমিযী- হা. ২২৬৫, আবূ দাউদ- ৪৭৬০, সহীহ; মুসলিম- ১৮৪৫)।

এ মর্মে সাহাবী 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনুগত্যের শপথ প্রসঙ্গে বলেন : "আমরা সুখে-দুঃখে এবং কঠিন ও সহজ অবস্থায় (এমন কি) আমাদের উপর অত্যাচার করলেও শাসকের কথা শুনা ও আনুগত্য করার উপর বাইআত গ্রহণ করেছি। আর এ মর্মেও বাইআত করেছি যে, যতক্ষণ না প্রকাশ্য কুফুরী দেখতে পাবো, ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা নিয়ে শাসকের সাথে কোনো বিতর্ক করবো না।" (বুখারী- হা. ৭০৫৬; মুসলিম- ১৭০৯/৪২)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহলে হাদীসের মতাদর্শ হলো জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া; বরং তাদের জুলুম-অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা, যে পর্যন্ত না ভালো লোক স্বস্তি পায় অথবা ফাসেক হতে মুক্তি মেলে"– ('মাজমূ'আ ফাত্ওয়া'- ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ রাহিমাহুল্লাহ, তাহক্বীক্ব : আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম, প্রকাশনা : মুজাম্মা' আ মালিক ফাহাদ লিত-ত্বিবা'আতিল মুসহাফ আশ্ শারীফ, মদীনা, ৪/৪৪৪ পৃষ্ঠা)।

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, "আহলুস সুন্নাহ তথা আহলে হাদীসগণ নবী থেকে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস থাকার কারণে ফেতনার সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিষয়টি তাঁদের 'আক্বীদাহ্সমূহে উল্লেখ করেন। আর শাসকদের জুলুম-অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের আদেশ করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। যদিও অনেক আলেম-উলামাহ ফেতনার সময় যুদ্ধ করেছেন।" ('মিনহাজুস সুন্নাহ আন্ নববীয়্যাহ'- ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ রাহিমাহুল্লাহ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম, প্রকাশনা : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, ৮/৫২৯ পৃ.)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। আর তা হলো– বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছিলেন আহলে হাদীসগণ। ভারতবর্ষের আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস আহলে হাদীসগণকে বাদ দিয়ে ইতোপূর্বে কেউ লেখেনি এবং লেখাও সম্ভব হবে না। বলবেন, আপনারাতো বলেন, আহলে হাদীসগণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করেন না। তাহলে ভারতবর্ষে আযাদী আন্দোলনে আহলে হাদীসগণ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কেন? জবাবে আমরা বলব– বলুন! বৃটিশরা কি মুসলিম শাসক ছিলেন? তারা কি ভারত বর্ষের আদি অধিবাসী না দখলদার? এ দু'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বুঝলেই আর কেউ এরূপ অবান্তর প্রশ্ন করবে না। আহলে হাদীসগণ মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে অতি সতর্ক ও সাবধান। আর এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও আদর্শ।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর 'ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই 'ইবাদত পূর্ণ শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তার সাথে আদায় করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উত্তম। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সাধারণ মুসলিম জনগণ নিরাপত্তার সাথে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করতে পারবেন এবং শাসক ইসলামী ফৌজদারী দণ্ডবিধি কার্যকর করে শান্তিময় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। আসল উদ্দেশ্য বুঝতে হবে– রাষ্ট্র ক্ষমতা ইসলামের মূল নয়; বরং সহায়ক। কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ক্ষমতাকেই মূল 'ইবাদত ও ইকামতে দ্বীন বলে বিশ্বাস করে সে পথে সংগ্রাম অব্যাহত রেখে চলেছেন। আর মূল বিষয়কে গৌণ ভেবে আহলে হাদীসগণের সমালোচনা করছেন।

রাজনীতিই ধর্ম- এ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত ইসলাম বুঝলে এ রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো না।

'ইবাদতই মূল এবং রাষ্ট্র এর সহায়ক- এ সত্য উপলব্ধি করুন, সকল প্রকার সন্দেহের অবসান ঘটবে ইশা-আল্লাহ। ❑

# আল-কুরআনের জ্যোতি

**আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :**

۞ ﴿يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

☆ "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করো এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা আন্ নিসা : ১)*

۞ ﴿وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ﴾

☆ "স্মরণ করো; যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি কালো পচা কদম থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।" *(সূরা আল হিজ্র : ২৮)*

۞ ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾

☆ "হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক তবে অনুধাবন করো, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি– (১) মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাকাহ হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড হতে, যাতে আমি বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৫)*

۞ ﴿اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ﴾

☆ "মানুষ কি দেখে না যে, নিশ্চয় আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।"

*(সূরা ইয়া-সীন : ৭৭)*

۞ ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

☆ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাক্বওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"

*(সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩)*

۞ ﴿هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۞ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

☆ "অবশ্যই মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব; তাই আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।"

*(সূরা আদ্ দাহ্র/ইনসান : ১-২)*

۞ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ﴾

☆ "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।" *(সূরা আত্ ত্বা-রিক্ব : ৫-৬)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

# শিশু শিক্ষা : পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি

–মো. আব্দুল মালেক মাদানী*

**রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী**

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ". ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾.

**সরল অনুবাদ**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্‌রাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজক) রূপে গড়ে তোলে। যেমন- চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোনো (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিলাওয়াত করলেন :

﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾

"আল্লাহর দেয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ করো, যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন।"[১]

**রাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী**

**জন্ম :** তিনি হিজরি পূর্বকালে জন্ম গ্রহণ করেন।

**নাম ও বংশ পরিচয় :** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শাম্‌স বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

**আবূ হুরাইরাহ্ নামে পরিচিত হওয়ার রহস্য :** আবূ হুরাইরাহ্ নামটিতে একটি মজার কাহিনি রয়েছে। একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে রসিকতা করে– أَبَوْ هُرَيْرَةَ 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন। একদিন তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন দেখে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন– কিহে, আবূ তুরাব! মাটিতে শুয়ে আছ কেন? এরপর থেকে তার নাম আবূ তুরাব হয়। এ নামেও তিনি পরিচিত।

**ইসলাম গ্রহণ :** প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহর্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

**যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** ইবনু আসীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসলাম গ্রহণের পর হতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

**হাদীস শাস্ত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবদান :** বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৫টি। এ কারণে তাকে 'হাদীস বর্ণনাকারীদের নেতা' বলা হয়। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রথমে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যা শুনতেন তাই ভুলে যেতেন। একদিন রাসূল ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি যা পড়ি

* *সহকারী অধ্যাপক, কাঞ্চনপুর এলাহিয়া (ডিগ্রি) ফাযিল মাদ্‌রাসা ও সহ-সভাপতি, নীলফামারী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১] *সূরা আর্ রূম : ৩০; সহীহুল বুখারী- হাদীস নং- ৪৭৭৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২২/২৬৫৮।*

তাই ভুলে যাই।' তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমার চাদরটি আমার সামনে মেলে ধরো।' তিনি তা মেলে ধরলে, রাসূল ﷺ নিজের দুই হাত ভরে পানি নেয়ার মতো করে তা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চাদরে ঢেলে দিলেন। যেন তিনি হাত ভরে কোনো কিছু নিয়ে তার চাদরে ঢাললেন। এরপর বললেন, 'আবূ হুরাইরাহ্, চাদরটি তোমার বুকে জড়িয়ে নাও।' তিনি তা জড়িয়ে নিলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এরপর থেকে আমি আর কোনো কিছু ভুলিনি।'[২]

এটিই ছিল তাঁর 'ইল্‌মের বরকত। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবীজী ﷺ-এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মাত্র আড়াই বছরের মতো। কিন্তু এ অল্প সময়েই তিনি অন্য সকল সাহাবী থেকে বেশি হাদীস মুখস্থ করেছেন ও বর্ণনা করেছেন।

**ইন্তেকাল :** ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাকে বাকিউল গারকাদে দাফন করা হয়।

### হাদীসটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

**ফিতরা শব্দের শাব্দিক অর্থ :** অভিধানে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-

**স্বভাব উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা, তরিকা, ছিঁড়ে ফেলা বা ফাটিয়ে ফেলা ইত্যাদি পারিভাষায় :** আল্লামা আবূ হাবিব বলেন, প্রত্যেক সৃষ্টিবস্তুর অস্তিত্বের প্রারম্ভিকতায় যে স্বভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই **فطرة**।

আল্লামা তীবী, কুরতুবী ও তাওরীশী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সত্য ও ন্যায় গ্রহণের শক্তিকেই (**فطرة** ফিত্বরাহ্) বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে প্রথম থেকেই সংস্থাপন করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, সুস্থ বিবেক বুদ্ধিকেই (**فطرة** ফিত্বরাহ্) বলা হয়, যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

কতিপয় আলেম বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই প্রত্যেক মানব সন্তানের প্রাথমিক অবস্থাকে (**فطرة** ফিত্বরাহ্) বলা হয়।

[২] *সহীহুল বুখারী।*

**كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ (যেমন- "চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়)-এর ব্যাখ্যা :** রাসূল (ﷺ) উল্লেখিত বাণী দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একটি চতুষ্পদ জন্তু তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ত্রুটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালনপালনের ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে সেটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। তেমনি মানব সন্তানও নিষ্পাপ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তার ফিতরাতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা অমুসলিম তথা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান বা অগ্নিউপাসক হলে সেও অনুরূপ ধর্ম গ্রহণ করে থাকে। আর পিতা-মাতা খাঁটি মুসলমান হলে, তারা তাকে আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে গড়ে তোলেন।

হাদীসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুর জন্ম তাওহীদের উপর। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে শিশুদের ব্রেনে আল্লাহ তা'আলা ঈমানী প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছেন। যেমন- আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শিশুদের ব্রেন গবেষণা করে বলছেন, শিশুদের ব্রেনের কোষগুলো স্বীকৃতি দিচ্ছে গোটা বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। সকল বস্তু অস্তিত্বে আসার মূল কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা একজন, অধিক সংখ্যক নন। তারা আরো বলেন, ব্রেনের কোষগুলোতে সত্য কথা বলা ও ভাষা শিক্ষার প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছে।[৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বর্তমানে শিশুর সে ফিতরাতকে মুল্যায়ণ করা হচ্ছে না, শিশুর মানুষিক বিকাশের মতো সুন্দর ও উপযুক্ত পরিবেশও আমরা তাদেরকে তৈরি করে উপহার দিতে পারছি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও যেন তাদের সে ফিতরাতকে গঠন না করে ধ্বংস করছে ২০২৩ সালের শিক্ষা সিলেবাস তো এটাই প্রমাণ করছে।

**হাদীসের শিক্ষা :** এ হাদীস থেকে এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে একটি শিশুর মাঝে লোকায়িত ফিতরাত তার চরিত্রে প্রকাশিত হবেই। পিতা-মাতা, পরিবেশ যদি এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তাহলে আদর্শ শিশু গঠন সম্ভব। ❑

[৩] *তথ্যসূত্র : ড. আব্দুদ দায়িম আল কাহিল, সিরিয়া।*

## প্রবন্ধ

# নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

*[পঞ্চম (শেষ) পর্ব]*

ভাষা ও সংস্কৃতি একটি জাতির একান্ত ও স্বোপার্জিত সম্পদ। এটি কখনো নিঃশেষ হয় না। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনে পরাভূত না হয়ে নিজ মহিমায় টিকে থাকে। উপনিবেশ কিংবা কর্তৃত্ববাদী শক্তি কিন্তু কখনো কখনো একটি জাতির ভাষা-সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। মুছে ফেলতে চায় তার চিহ্ন পরিচয়। কিন্তু হয়ে উঠে না। বিবাদ-বিসংবাদ, খুন-খারাবিও হয়। ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে চিরচেনা আবাস থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়।

কয়েক বছর আগে কোলকাতায় গিয়ে স্মৃতিচিহ্ন, সংস্কৃতি ও স্থান নাম বিকৃতির সয়লাব দেখেছি। কোলকাতাতেই নয়, সারা ভারতে। গুরগাঁও[৪] অঞ্চলের মুসলমানরা নামটাও বদলে ফেলছে। দোকানের কর্মচারী, ময়রা, বাবুর্চি হিন্দু রাখতে হচ্ছে। বানারসে হোটেলের নামও পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও যেন শেষ রক্ষা হচ্ছে না। সারা ভারত থেকে মুসলমানদের নিপাত করতে চায়। নিপাত করতে চায় বাঙালি মুসলমানদের নাম-পরিচয়। নাম-পরিচয়হীন জাতিতে পরিণত করতে চায়। অবশ্য এ ধরনের প্রচেষ্টা যুগে যুগে নেয়া হয়নি এমনটি নয়; স্পেনে কিংবা পূর্ব তুরস্কে তা দেখতে পাই। হালে প্যালেস্টাইন ও মায়ানমারে জিঘাংসার লেলিহান শিখা বিশ্ব বিবেককে অগ্নিদগ্ধ করেছে।

সম্প্রতি ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতায়নে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাষা ইত্যাকার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন ও আগ্রাসন সংস্কৃতি প্রেমিদের হতবাক করে তুলেছে। সংস্কৃত ভাষা হিন্দু গ্রন্থাদির ভাষা। অধুনা সংস্কৃতের সোপান বেয়ে বহু বছরের যাচাই বাছাই ও অনুশীলনের পরিক্রমায় বাংলা ভাষা বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। বিশেষত বাংলাভাষী প্রায় ৪০ কোটি মানুষের কাছে বাংলাভাষার বিকল্প নেই। অথচ মুসলিম মাদ্‌রাসাসমূহেও সংস্কৃত ভাষা পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে আমার একটি লেখায় আলোকপাত করেছি যে, কেরলের ত্রিপুরের একটি ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআনের পাশাপাশি ভাগবতগীতা পঠিত হচ্ছে। অথচ গীতা মহাভারত কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। পৌরাণিক কাহিনীর পরিবেশনা মাত্র। 'উলুহিয়াত'-এর বাণী সম্বলিত কুরআন একটি ধর্মগ্রন্থ। যেখানে তাওহীদ, আহকাম ও নসীহত সন্নিবেশিত আছে। সেখানে পৌরাণিক ও দেব-দেবীর কাহিনী ছাত্রদের মেধা বিকাশে কী-ই বা কাজে লাগতে পারে? অথচ মাথায় চন্দনের তিলক কেটে হাতে গীতা, বেদ-উপনিষদ নিয়ে হিন্দু গুরু ক্লাসে ঢুকছেন। গুরুর নির্দেশে ছাত্রদের অবলীলায় আবৃতি করতে হচ্ছে– "গুরু : ব্রহ্ম, গুরু : বিষ্ণু, গুরু : দেব মহেশ্বর, গুরু : সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্মৈশ্রী গুরুদেব নম।" পাঠক! মুসলমান ছাত্ররা তার গুরুর, কল্যাণ কামনা করে বলে, আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সেখানে হিন্দু গুরু বিশেষায়িত হচ্ছেন নানাভাবে; কিন্তু কল্যাণ কামনার লেশমাত্র নেই তাদের মন্ত্রপূত উচ্চারণে। ভাষার ক্ষেত্রেও নিপতিত হয়েছে গেরুয়া প্রভাব। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে উর্দু একটি বহুল প্রচলিত ভাষা। ভাষাটি উত্তর ভারতে প্রবলভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু সে ভাষাটি ব্যবহারে কিংবা পরিবর্তন সাধনে দারুণভাবে পরিকল্পনা আঁটছে। বলিউডের মতো সংস্কৃতি বিকাশের লালন ক্ষেত্রেও ভাষাগত সুক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে।[৫] আগের প্রজন্মের সিনেমার শিরোনাম হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দু হরফে নিয়মিত লেখা থাকতো। ছবির সংলাপ ও গানের কথায় উর্দু শব্দের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। এখন ছবিতে উর্দুর ব্যবহার একেবারে কমিয়ে ফেলা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে চলচ্চিত্র জগতেও ভিন্নতার লহরী ঝংকৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডান ঘরানায় আবদ্ধ হয়ে বলিউডের সিনেমাগুলোর কাহিনী ও নির্মাণ শৈলীতে পরিবর্তন দৃশ্যমান। যে বলিউড এক সময়ে ওমর আকবর অ্যান্টনির মতো ধর্মীয় সহনশীলতা উদ্‌যাপন করা ক্লাসিক নির্মিত হতো (যেখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী তিনটি নায়ক চরিত্র ছিল), সে মূলধারার বলিউড এখন প্রায়ই বিজেপি এবং দলটির ভারত-সম্পর্কিত ধারণার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরুর

* ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৪] উত্তর ভারতের শীর্ষস্থানীয় শহর। নতুন দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমের এই শহরটি প্রযুক্তি ও অর্থনীতির চক্র কেন্দ্র।

[৫] প্রথম আলো- ২৩ জানুয়ারি-২০২৩, পৃ. ৮, কলাম ৫।

ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বলিউডে এখন মৃতপ্রায়। বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লেখক ও চলচ্চিত্র বিশ্লেষক সালমান জাফর অবস্থাদৃষ্টে অভিমত দেন যে, এখনকার বলিউডের গড় ভাষ্যটি সোজা কথায়, ভারত হলো হিন্দুদের দেশ এবং এখানে যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এসেছেন, তারা হিন্দুদের মাতৃভূমির ক্ষতির জন্য দায়ী। ভারতের ক্ষমতাসীনদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে এবং বলিউডে প্রতিফলিত হচ্ছে। যেসব নির্মাতা এই পেশীশক্তিওয়ালা উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু ভারতের আখ্যানকে সমর্থন করছেন না, তারা বিজেপির সমর্থক শিবির থেকে ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অভিনেতা আমির খান ও শাহরুখ খান ২০১৫ সালে ভারতে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, তারপর থেকে তাঁদের সিনেমা বর্জন করার জন্য নিয়মিত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ইসলাম ফোবিয়া রীতিমতো একটা বিষয় আকারে যেন নিবন্ধিত হয়ে পড়েছে। সার্বক্ষণিক নানান নজরদারি ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ কোণঠাসা হতে চলেছে।

সংস্কৃতি চর্চার রকমফের জাতি-সমাজকে সমৃদ্ধ করে। নানা সেক্টরে বিভাজ্য সংস্কৃতির উৎকর্ষতা সামগ্রিকভাবে একটি দেশ জাতির অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করে। স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ তাদের ভাবনা প্রকাশ করে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পায়। কিন্তু অধুনা বিশ্বে সংস্কৃতি ও মত প্রকাশের চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে। মত প্রকাশে ঘৃণাভাষণ কিংবা বিষোদগার ছড়ানো রীতিমতো বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগৃহীত হয়েছে। অপরের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা 'বৈচিত্র্যপূর্ণ মত' প্রকাশের মোড়কে সমাজকে অস্থির করে তুলছে। সম্প্রতি ইউরোপের কট্টর ডানপন্থি ইসলাম বিরোধী সংগঠন প্যাট্রিওটিক ইউরোপিয়ানস অ্যাগেইনস্ট দ্য ইসলামাইজেশন অব দ্য ওয়েস্টার (পোগিডা) নেতা এডভিন ভাগেনসভেলড গত সপ্তাহের শুরুতে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে প্রকাশ্যে পবিত্র কুরআন ছিঁড়ে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক কথাবার্তা বলে সে দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছেন। তার সেই অসহিষ্ণুতা এতটাই চরমপন্থী ছিল যে, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমেরিকার ডান ঘরানার রাজনীতিকদেরও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা মনে হবে। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ড্যানিশ চরম ডানপন্থী দল স্ট্রাম কার্সের (হার্ডলাইন) নেতা রাসমুস পালুদান স্টকহমে তুর্কি দূতাবাসের সামনে প্রকাশ্যে পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে দেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, একটি ধর্মগ্রন্থ পোড়ানোর মধ্য দিয়ে কোনো ধর্মকে নিঃশেষ করা যায় না। ঘৃণা বাড়ে, বাড়ে বিদ্বেষ। কেননা ধর্ম একান্তভাবেই বিশ্বাসের বস্তু। বিশ্বাসকে আঘাত করে ধর্মের তেমন ক্ষতি হয় না। অথচ ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে কিংবা অবমাননা করে তারা চরম বালখিল্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সভ্য সমাজে অপরের বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখা সম্প্রীতির যে কতবড়ো উপায় তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

একটি ধর্মের অনুশীলিত আচার-কৃষ্টি ধর্মকে সমৃদ্ধ করে। ধর্ম বোধ জাগ্রত করে একটি সহনশীল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আরবি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের অনুকরণে ইন্‌শা-আল্লাহ'র মতো শব্দ চয়ন পশ্চিমা হিপ-হপ ধারার সঙ্গীতের অনুরাগী ইসমায়েল লিয়া দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ নিত্য জীবনের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি যা জীবন চর্চার একান্তই উপাদান সেগুলো ইসলামের হওয়ায় অকারণে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। মুছে ফেলার অপপ্রয়াস সচরাচর পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার ক্ষত যেন আজও শুকায়নি। নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বাবরি মসজিদ ধ্বংস প্রভৃতি যেন প্রতিনিয়ত মুসলমানদের কুরে কুরে খাচ্ছে। অন্যদিকে জিঘাংসার উল্লাস গেরুয়াধারীদের সতত উৎসাহিত করছে। তদানীন্তন গুজরাটের মুখমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের উস্কানি ও পৃষ্ঠপোষণা আজও বিশ্ববিবেককে বারে বারে হানা দিচ্ছে। ওই অপকর্মের পুরস্কার হিসেবে হিন্দুত্ববাদীরা তাঁকে সারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন করেছে। যেমনটি আমরা দেখেছি রাজস্থানের রাজসামান্দ অঞ্চলের হিংস্র নরপশু শম্ভুলাল রেগারকে সে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে শ্রমিক মুহম্মদ আফরাজুলকে। শুধু তাই-ই নয়, রীতিমতো ওই পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে সোস্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেয়। তার এ কর্মকাণ্ডকে বীরোচিত আখ্যা দিয়ে ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রার্থী বানানোরও কথা চলছিল। হত্যাকাণ্ড সংঘটন কিংবা তার নেতৃত্ব দিলে নেতা হিসেবে বরণের মতো কাজও করা হয়। যেমনটি নরেন্দ্র মোদিকে মনোনয়ন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে।

একটি রাষ্ট্রের প্রাণ হলো– অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে থেকে প্রজাপালনই রাষ্ট্রধর্ম-রাজধর্ম। কিন্তু রাষ্ট্রই যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয় সেখানে স্থিতিশীলতা কীভাবে বজায় থাকবে? অথচ স্থিতিশীলতা কিন্তু উন্নয়নের চাবি। সমৃদ্ধির চাবি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় যারা ভারতকে ভালোবেসেছে, ভারতে জন্মলাভ করে ধন্য হয়েছে, মাটি ও সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়েছে, তারা

তো ভারত ছাড়েনি। এখানে বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের একটা উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, দেশটি হিন্দুর না, মুসলমানের না; দেশটি তাঁর যে দেশকে ভালোবাসে। সুতরাং তাদেরকে ভিনদেশী ভাবার অবকাশ কোথায়? ধর্ম তো বিশ্বাসের ব্যাপার। তার লালিত বিশ্বাস একটি সমাজ-রাষ্ট্রের শক্তি। সে শক্তি দিয়ে রাষ্ট্র সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। সেখানে হিন্দুত্ববাদীর মুসলমানদের চিহ্নিত করে 'না' অভিধায় আখ্যায়িত করে দেশ থেকে তাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; নয়তো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বসবাস করবার সনদ প্রণয়ন করে রেখেছে। তাঁদের হাজার বছরের স্মৃতি ঐতিহ্য মুছে ফেলবার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অতিসম্প্রতি মোদি সরকার স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'অমৃত মহোৎসব' পালন করছে। 'আজাদিকা অমৃত' মহোৎসব পালন উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহ্যবাহী মুঘল গার্ডেনের নাম বদলে ফেলা হয়েছে। পরিবর্তিত নাম রাখা হয়েছে 'অমৃত উদ্যান' মুঘলদের শখের ও সাধের বাগানের নামের পরিবর্তন শুধু হয়নি এতে বিলুপ্তি ঘটেছে তিনশত বছরের মুঘল ঐতিহ্যের যার সাথে ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে আত্মার সম্পর্ক।

মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন তাজমহল নিয়েও শুরু হয়েছে তুলকালাম কাণ্ড। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে গেরুয়া শিবিরের আলোচনা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পৌঁছেছে। তেজোমহালয়া নামকরণের যুক্তি ধোপে না টেকায় অধূনা ভিন্ন আবদার জুড়েছে তারা। তাজমহলের পূর্বের দিকে ২২টি কুঠরি আছে। তারা প্রশ্ন তুলেছে ঘরগুলোতে নাকি হিন্দু দেবতা শিবের মন্দির রয়েছে। ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জনৈক রজনীশ শিং ঘরের তালা খোলার আবেদন জানিয়েছেন। প্রমাণিত সত্য যে, তালাবদ্ধ কুঠরিতে কোনো মন্দির নেই। সম্রাট যখন সৌধে আসতেন তখন এসব প্রশস্ত সুন্দর এবং শীতল কক্ষগুলোতে বিশ্রাম নিতেন। অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনার এশিয়ান আর্টস বিভাগের প্রফেসর এবাকচ এমনি অভিমত দেন। আসলে নানা অজুহাতে এ সকল নিদর্শনাদি নিশ্চিহ্ন করে মুসলমানদের নাম পরিচয়হীন করে তোলার ফন্দি-ফিকির ছাড়া এগুলো আর কিছু নয়। অনুরূপভাবে জ্ঞানবাপী মসজিদের অজুর ফোয়ারা নিয়েও প্রশ্নজাল নিক্ষেপ করেছে। অজুখানার ফোয়ারাটি নাকি শিবলিঙ্গ! বিশাল ভারতের সাড়ে শত বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনামলে মুসলমানরা ভিন্নধর্মীদের জমি দখল করে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করবে না এটা পরীক্ষিত সত্য। হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আজও বোদ্ধা মহলে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ❑

## কবিতা

# আমার বুকেতে আমারি কবর

**–মোল্লা মাজেদ***

আমি লিখবো না আর কবিতা কাব্য ছন্দ
গীতিময় মহা গান
আমার জীবনে থাকবে না কোনো শিল্প-ছবি
মহান শিল্পীর প্রাণ।

অবক্ষয়ের বেসাতি শুধুই ঘোরে
নিতুই দেখেছি দ্বার থেকে দ্বারে দ্বারে
বিশ্বের সভা বরণ করেছে তারে
দেবে আর নেবে সবি একাকার
নন্দিত উপহারে।

আমি লিখবো না আর কবিতা কাব্য ছন্দ
তিমিরাচ্ছন্ন বিষাদিত এই প্রাণে
মনেতে আমার লেগেছে এ কোন দ্বন্দ্ব
মুখরিত নেই জীবনের জয় গানে,
নিষ্ফল সব আশাগুলো ঘোরে
বঞ্চিত আহ্বানে।

আমি লিখবো না আর ইতিহাস কোনো
ফেলে আসা ইতি কথা
আমার হৃদয়ে জ্বলিছে সদা
তীব্র দাহের ব্যথা।

আমার বুকেতে আমারি কবর খোঁড়া
এই মোর উপহার
হৃদয়ের মাঝে হৃদয়ের শক্ত আড়া
নেই কো জবাব তার
এ কোন নেশার দাব-দাহে জ্বলে
কাবুল কান্দাহার।

আমি লিখবো সে দিন কবিতা কাব্য
ছন্দ মুখর গান
নব-জাগরণে উঠবে যে দিন কাশ্মীর ঘিরে
ফিলিস্তিন আর বসনিয়াদের প্রাণ।

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

# মি'রাজ : একটি পর্যালোচনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

মি'রাজ বিশ্বনবী (ﷺ)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার এ দ্বীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন। এ মি'রাজের রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য হয়।

### ইস্‌রা ও মি'রাজ শব্দদ্বয়ের পরিচয়

إِسْرَاءٌ وَمِعْرَاجٌ ইসরা ও মি'রাজ-এ দু'টো শব্দ সকল মুসলিমের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। দু'টোই আরবি শব্দ। إِسْرَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ। আর مِعْرَاجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ করার মাধ্যম। عُرُوْجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়িতে আরোহণ করা বা ঊর্ধ্বে গমন করা।

### মি'রাজ এর সঠিক সন ও তারিখ

'মি'রাজ' সংঘটিত হয়েছিল রজব মাসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজ যখন হয়েছিল তখন সাল ও তারিখ লেখার চর্চা ছিল না বলে মি'রাজ সংঘটনের সঠিক সাল ও তারিখ নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ ব্যাপারে ১০টিরও বেশি অভিমত আছে।[৬] তা হলো এই–

১. হিজরতের ছয় মাস আগে।

২. ইমাম ইবনুল জাওযীর মতে, নবুওয়াতের ১২ সনের ২৭ রজবের রাতে।[৭]

৩. ইবনু সা'দের বর্ণনায় আছে, হিজরতের এক বছর আগে ১৭ই রবিউল আউয়ালে।

৪. তাঁর অন্য বর্ণনায় মি'রাজ সংঘটিত হয় হিজরতের আঠারো মাস আগে সতের (১৭) রামাযান শনিবার রাতে।[৮]

৫. আল্লামা ইবনু 'আবদুল বার প্রমুখ বলেন, মি'রাজ ও হিজরতের মাঝে চৌদ্দ মাসের ব্যবধান ছিল।[৯]

৬. ইব্‌রা-হীম হারবীর মতে, হিজরতের এগার মাস আগে।

৭. ইবনু ফা-রিস বলেন, পনেরো মাস আগে।

৮. আল্লামা সুদ্দী বলেন, সতের মাস আগে।

৯. ইবনু কুতাইবার বর্ণনায় আঠার মাস আগে।

১০. ইবনুল আসীরের মতে, হিজরতের তিন বছর আগে।

১১. কাযী ইয়ায ও কুরতুবী এবং ইমাম নববী প্রমুখ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের পাঁচ বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[১০]

আল্লামা কাযী সুলাইমান মনসূরপুরীর মতে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের দশম সনে সাতাশে রজবের রাতে।[১১]

ইংরেজি তারিখ ছিল ৬২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ তথা হিজরতের দু'বছর আগে ২৭শে রজবের রাতে।[১২]

বর্তমানে বহুল প্রচলিত মত অনুসারে ঐ রাতটা ছিল ২৭শে রজবের রাত এবং এটা ছিল নবুওয়াতের ১০ম সাল।

### মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

রাসূল (ﷺ) মক্কায় মাসজিদে হারাম হতে বোরাকে চড়ার পর জিবরাঈলের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হন। হঠাৎ রাস্তার এক দিকে তিনি একটি বুড়ীকে দেখতে পান। তিনি (ﷺ) বলেন, এটা কে? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তিনি চলতে থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি জিনিস তাঁকে ডাকলো, আসুন, হে মুহাম্মাদ! তখন জিবরাঈল তাঁকে বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তাই তিনি চলতে লাগলেন। অতঃপর মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা, হে হাশির (যাঁর পরে কেউ নেই)। তখন তাঁকে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, আপনি সালামের জওয়াব দিন। তাই তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁদেরকেও তিনি ঐরূপ বললেন।

পরিশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে পানি ও মদ এবং দুধ পেশ করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুধটাকে গ্রহণ করলেন।

---

* *লেখক : গবেষক ও গ্রন্থ প্রণেতা।*

[৬] *ফাতহুল বারী- ৭/২০৩ পৃ.।*

[৭] *সীরাতে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া- ২৬৮ পৃ.।*

[৮] *ত্বাবক্বা-তু ইবনু সা'দ- ১/১৬৬ পৃ.।*

[৯] *যা-দুল মা'আ-দ- ৩/৩৭ পৃ.।*

[১০] *ফাতহুল বারী- ৭/২০৩ পৃ.।*

[১১] *রহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন- ৭০ পৃ.।*

[১২] *পয়গম্বরে আযম ওয়া আ-খির- ৩৪৫ পৃ.।*

অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, আপনি স্বভাবজাত প্রকৃতিকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি পানিটা পান করতেন তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং আপনার উম্মতও ডুবে যেত। আর আপনি যদি মদটা পান করতেন তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং আপনার উম্মতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত।... তারপর জিবরাঈল বলেন, সেই বুড়ীটা যাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই অংশ যতটা বয়স এই বুড়ীটার বাকি আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল মহান আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে চেয়েছিল যে, আপনি তার দিকে ঝুঁকে যান। আর যাঁরা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইব্‌রা-হীম এবং মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)।[১৩]

এছাড়াও বায়তুল মুকাদ্দাসের পথে আরো অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা অবলোকন করেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন এবং সকল নবীদের ইমাম হয়ে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। তারপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈলের সাথে প্রথম আসমান হয়ে সপ্তম আসমানে গিয়ে মহান আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত অনেক নবীদের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছিল।

### নবীদের সাথে সাক্ষাতের রহস্য

মি'রাজের রাতে কতিপয় বিশিষ্ট নবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঐ সাক্ষাতের রহস্য সম্পর্কে রহস্যসন্ধানী কোনো কোনো 'আলেম কিছু তথ্য পেশ করেছেন। তা হলো এই–

১. মি'রাজের রাতে ১ম আকাশে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাৎ হয়। অন্যদের মতে, আদম (আলাইহিস সালাম)-কে যেহেতু জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেহেতু তাঁর সাথে প্রথমেই রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষাৎ হওয়াতে এ কথার সতর্কবাণী রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও তাঁর মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনার দিকে হিজরত করতে হবে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, দু'জনকেই প্রিয়ভূমি ত্যাগ করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তারপর দু'জনেরই পরিণতি সেই প্রিয়ভূমিতেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে। যেখান থেকে তাঁদের দু'জনকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।[১৪]

২. ২য় আকাশে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষাৎ হয়। তা এই জন্য যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের নবী।[১৫]

অন্য বিদ্বানের মতে, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর হিজরতটা হয়েছিল দুশমনির কারণে এবং তাঁকেও মেরে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।[১৬]

৩. ৩য় আকাশে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইয়েরা যেমন তাঁকে হত্যার চেষ্টা করছিল। তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর কুরাইশ ভাইয়েরা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এমতাবস্থায় শেষ পরিণতি ইউসুফেরই হাতে থাকে। তেমনি ঐরূপ পরিণতি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরও হয়েছিল। যেমন- তিনি মক্কা বিজয়ের দিনে কুরাইশদেরকে সেই কথাটিই বলেছিলেন যে কথাটি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন : লা-তাস্‌রীবা আলাইকুমূল ইয়াওম্‌... আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোনো রকমই অভিযোগ নেই।[১৭]

৪. ৪র্থ আকাশে ইদরিস (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রাসূলূল্লাহ'র সাক্ষাৎ হয়। ইদরিস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন– অরাফা'না-হু মাকা-নান আলিয়্যা– আমি তাঁকে উচ্চমর্যাদা দান করছি। তেমনি মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উচ্চমর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৫. ৫ম আকাশে হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য হিসাবে ভাবা হয় যে, হারুন (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর জাতি কষ্ট দেয়ার পরে যেমন তাঁকে তারা ভালো বেসেছিল। তেমিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্বওমও তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করার পর তাঁর প্রতি অঢেল প্রেম ঢেলে দিয়েছিল।

৬. ৬ষ্ঠ আকাশে মূসা নবীর সাথে তাঁর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য এই যে, মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর ক্বওম খুবই কষ্ট দিয়েছিল।[১৮]

### মি'রাজের রাতে উপহার

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় আছে, যখন আমি পালনকর্তা এবং মূসার মাঝে ফেরাফেরী করছিলাম তখন একবার আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে থাকল। প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ

[১৩] *তাফসীরে ত্বাবারী- ১৫/৫ পৃ.।*
[১৪] *ফাতহুল বারী- ৭/২১০ পৃ.।*
[১৫] *ফাতহুল বারী- ৭/২১১ পৃ.।*
[১৬] *আল ইস্‌রা- ৭২ পৃ.।*
[১৭] *আল ইস্‌রা- ৭২ পৃ.।*
[১৮] *ফাতহুল বারী- ৭/২১১ পৃ.।*

নেকী তাই ওটা পঞ্চাশ নামায হলো। যে ব্যক্তি ভালো কাজের সংকল্প করবে। অতঃপর সে ঐ কাজটা করল না তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য দশটা নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করবে। অথচ ওটাকে সে করল না তার জন্য কোন জিনিসই লেখা হবে না। কিন্তু সে যদি ওটাকে করে ফেলে তাহলে তার জন্য একটি মন্দ লেখা হবে।[১৯]

বিশিষ্ট সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছিল : ১) পাঁচওয়াক্ত নামায ২) সূরা আল বাকারার শেষাংশ ৩) তাঁর উম্মাতের যে ব্যক্তি কোন জিনিষকেই মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে না তার ধ্বংসাত্মক পাপগুলোকে ক্ষমা করা।[২০]

### মি'রাজ উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়

মি'রাজ উপলক্ষে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সভা-সেমিনার এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের 'ইবাদত করা হয়। যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি। আসলে এগুলোর কুরআন ও সুন্নায় ভিত্তি আছে কিনা এ সম্পর্কে কোনো খেয়াল করা হয় না।

### মি'রাজ ও নফল নামায

অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা মি'রাজ উপলক্ষে কেউ ১২ রাক'আত, কেউ ২০ রাকাত নামায আদায় করে থাকেন। ইসলামী শরিয়তে মি'রাজের নামায বলে কিছু নেই। নফল নামায পড়া সওয়াবের কাজ কিন্তু মি'রাজ উপলক্ষে নফল নামায আদায় করার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ ইসলামে নেই। কাজেই মি'রাজের নামে নফল নামায আদায় করা এবং এর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা মানে ইসলামী শরিয়তে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করা। আর এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে আমাদের ধর্মে এমন কিছু সংযুক্ত বা উদ্ভাবন করবে, যা তার (শরিয়তের) অংশ নয়- তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[২১]

মি'রাজ উপলক্ষে রজব মাসের ফযীলাত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস শোনা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো– ১. আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের সালাতের পর বিশ রাক'আত সালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ ও সূরা আল ইখলা-স পড়বে...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ' বা জাল।[২২]

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত সালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশবার, কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব তিনবার, কুল আঊযু বিরব্বিন নাস তিনবার পড়বে। অতঃপর সালাত হতে ফারেগ হয়ে দশবার দরূদ পড়বে...' ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ'।[২৩]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের দিবসে সিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করবে, যার প্রথম রাক'আতে একশতবার আয়াতুল কুরসী পড়বে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ'। এর সনদে 'উসমান নামক রাবী মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[২৪]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ- মি'রাজের রাত্রিতে) 'ইবাদত করবে, তার 'আমলনামায় একশ' বছরের 'ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে'। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের সালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয় একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীসের দৃষ্টান্ত,

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ- "নামায হলো মু'মিনদের মি'রাজ।"[২৫]

আল্লামা ইবনু রজব, ইবনু হাজার আসকালানী, আস সুয়ূতী, মোল্লা 'আলী ক্বারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে বলেছেন : রজব মাসে বিশেষ কোনো সালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ

[১৯] *সহীহ মুসলিম- ১/৩০৪ পৃ.।*
[২০] *সহীহ মুসলিম- ১/৯৬ পৃ.।*
[২১] *সহীহুল বুখারী- ১/৩৭১।*
[২২] *কিতাবুল মওযূয়াত- ২/১২৩।*
[২৩] *কিতাবুল মওযূয়াত- ২/১২৩।*
[২৪] *কিতাবুল মওযূ'আত- ২/১২৩।*
[২৫] *বার চান্দের ফযীলাত- মুফতী হাবীব সামদানী, পৃ. ১২৩।*

পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল। কেননা, এ সবই বানোয়াট।[২৬]

### মি'রাজ ও নফল রোযা

আমাদের অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা- রমাযানের লাইলাতুল কদরের সাথে মিলিয়ে মি'রাজেও নফল রোযা রেখে থাকেন। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- নফল রোযা যখন ইচ্ছা তখন রাখা যায় কিন্তু কোনো উপলক্ষ্যে নফল রোযা রাখতে হলে অবশ্যই আগে জেনে নিতে হবে যে আমি বা আমরা যে উপলক্ষ্যে নফল রোযা রাখছি শরিয়ত সেটাকে অনুমতি দিয়েছে কি-না। মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল রোযা রাখার কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও তার অনুসারীরা এই দিনে বিশেষভাবে কোনো রোযা রেখেছেন এমন কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই দিনে মি'রাজ উপলক্ষে রোযা রাখা কোনো 'ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। মি'রাজের নফল রোযা সম্পর্কে অসংখ্য জাল হাদীস এসেছে। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ- মি'রাজ দিবসে সিয়াম পালন করবে, তার 'আমলনামায় ৬০ মাসের সিয়ামের নেকী লেখা হবে'। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীসে আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'রজব মাস মহান আল্লাহর মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মাতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের সিয়াম পালন করবে তার জন্য মহান আল্লাহর মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিবেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি সিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মতো হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে।... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।... জান্নাতের আটটি দরজা। তার জন্য খোলা থাকবে'। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি জাল।[২৭]

"রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুওয়াত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।"[২৮]

আরো একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করতেন। যোহর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকতেন, যোহরের পর অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাক'আত বিশেষ সালাত আদায় করতেন এবং 'আসর পর্যন্ত দু'আতে থাকতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।[২৯]

ইবনু হাজার আল আসকালানী, মোল্লা 'আলী ক্বারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আজলুনী, 'আবদুল হাই লাখনবী, দরবেশ হুত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭শে রজবের ফযীলত, এ তারিখের রাতের 'ইবাদত, দিনে সিয়াম পালন বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট জাল ও ভিত্তিহীন।[৩০]

### মি'রাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজ তথা ঊর্ধ্বলোকে গমনের উদ্দেশ্য ব্যাপক। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াতী জীবনে মি'রাজের মত এক মহিমান্বিত ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো মুখ্য তা হলো– (১) মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে হাযির হওয়া, (২) ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন, (৩) অদৃশ্য ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ, (৪) ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, (৫) স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন, (৬) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হওয়া, (৭) সুবিশাল নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করা এবং (৮) সর্বোপরি এটিকে একটি অনন্য মু'জিযা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। মি'রাজের শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে 'আবদ' বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। এর মর্মার্থ এই যে, বান্দার জন্য এর চেয়ে সম্মানিত কোন নাম মহান আল্লাহর কাছে নেই, থাকলে অবশ্যই সে নামে রাসূল (ﷺ)-কে সম্বোধন করে সম্মানিত করা হত। আর মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো সর্বপ্রকার গর্ব-অহংকার চূর্ণ করে মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো দাস হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দাসত্ব করা ও সালাতের হিফাযত করাই হলো মি'রাজের সবচেয়ে বড়ো এবং মূল শিক্ষা। ❑

---

[২৬] *আল মাসনূ- পৃ. ২০৮।*
[২৭] *কিতাবুল মওযূ'আত।*
[২৮] *তাবয়ীনুল 'আযাব- পৃ. ৬৪, তানযীহ- পৃ. ২/১৬১।*
[২৯] *আল আসার- 'আব্দুল হাই লখনবী, পৃ. ৭৮।*
[৩০] *আল আসার- পৃ. ৭৭-৭৯।*

# মৃত্যুর পরে আত্মার ঠাঁই কোথায়?

–ডা. সুলতান আহমদ*

আমরা মনে করি মরে গেলেই সব খেলা শেষ। যা হবার কবরে হবে! এই জগত থেকে পর জগতে স্থানান্তর হওয়াই হচ্ছে দিব্য চোখে মৃত্যু। আর এই মৃত্যুর পর আত্মা যায় কোথায় বা তার ঠাঁই কোথায়? এ নিয়ে সমাজে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। আবার কেউ বলে নির্ধারিত স্থান থেকে আত্মাকে কবরে আনা হয় না। এটি ভুল ধারণা। মহান আল্লাহর কাছে সব কিছুই সম্ভব। তাঁর ইশারা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "কুন", ফেরেশ্‌তা বলে "ফায়াকুন" মুহূর্তেই সব কিছু হয়ে যায়। অথচ অনেক মানুষ মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে খুব কমই মূল্যায়ন করে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কোনো বিপর্যয় নেমে আসে তখন বিভ্রান্তির বেড়াজালে আক্রান্তরা বলে এটা প্রকৃতির লিলা। অথচ প্রকৃতি কার দান তা ভাবে না।

আত্মা যায় কোথায় বা ঠাঁই কোথায় তা হাদীসের আলোকে একটু জানার ও মানার চেষ্টা করি। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হয়েছে বর্ণিত যে, তাদের 'আমল ও তাদের দু'আর জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ- তাদের দু'আ কবূল করা হবে না এবং তাদের 'আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, সেখানে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদের 'আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লি'য়্যীন বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে–

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

অর্থাৎ- "মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে।"[৩১]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কিরামরাও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন : মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশ্‌তারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মা'উত আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন : হে নিশ্চিন্ত আত্মা! পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আসো। তখন তার আত্মা, এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন- মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশ্‌তাদের কাছে সমর্পণ করে। ফেরেশ্‌তারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে– এ পাক আত্মা কার? ফেরেশ্‌তারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলে– ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশ্‌তারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফেরেশ্‌তা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমার এ বান্দার 'আমলনামা ইল্লি'য়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।"

এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশ্‌তা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে– তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলে– আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এবং দ্বীন ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়– এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে– আল্লাহর রাসূল। তখন একটি আওয়াজ হয় যে, আমার

* *উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সদস্য সচিব, আহবায়ক কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।*

[৩১] *সূরা ফা-ত্বির/মালায়িকাহ্ : ১০।*

বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়। এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কালো রঙের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ফেরেশ্তা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোনো কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশ্তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশ্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে– এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশ্তারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ- সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না; বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার 'আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের 'আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'আঁ-আঁ আমি জানি না' বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছাতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।[৩২]

এখন স্পষ্টত যে, নেক বান্দাদের আত্মা ঠাঁই পাবে ইল্লি'য়্যীন এবং সর্বত্রই তার সম্মান ও মর্যদা ঈর্ষণীয়। অপরদিকে মহান আল্লাহর নাফরমানী বান্দাদের আত্মার স্থান হবে ভয়াবহ শাস্তির জায়গা সিজ্জীনে। কবরের সাওয়াল জবাবের সময় মহান আল্লাহর হুকুমে আত্মাকে কবরে হাজির করা হবে। সুতরাং প্রচলিত ভুল অপসারিত হওয়া প্রয়োজন। ❑

[৩২] *মুসনাদ আহমাদ- ৪/২৮৭, ২/৩৬৪-৩৬৫, ৬/১৪০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৬২; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৬২।*

# সর্বপ্রাচীন গৃহ কাবার ইতিকথা

*[৩৪ পৃষ্ঠার পর]*

তৎকালীন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহু আনহু) ফাতাওয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহসমূহের জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমান যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থাতেই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফাতাওয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ সবসময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রিওয়ায়াতে জানা যায় যে, খানায়ে কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম উপাসনালয়। কুরআনে যেখানে মহান আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল (আলাইহিমাস সালাম) কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে– সেখানে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা কা'বা গৃহের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ করেননি; বরং সাবেক ভিত্তির উপরই নির্মাণ করেন। নিম্নের আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, কা'বা গৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই ছিল। সূরা আল হাজ্জের ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম।"

এতেও বুঝা যায় যে, কা'বা গৃহের স্থান পূর্ব থেকেই নিধার্রিত ছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে জানা যায় যে, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে কা'বা নির্মাণের আদেশ দেয়া হলে ফেরেশ্তার মাধ্যমে বালুর স্তূপের নিচের লুকায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়া হয়। মোটকথা আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এই হচ্ছে জগতের সর্বপ্রথম গৃহ বা উপাসনালয়। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে– আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একবার জিজ্ঞেস করলেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মাসজিদ কোনটি? উত্তর দেয়া হলো মসজিদে হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো এর পর কোনটি? উত্তর হলো মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তরে বলা হলো চল্লিশ বছর। অতঃপর যেখানেই সালাতের সময় তুমি সালাত আদায় করো, সেটাই মাসজিদ।[৩৩] এই হাদীসে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। ❑

[৩৩]. *সহীহ মুসলিম- ১/৫২০, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৫৩।*

# সন্তান লালন-পালনে বাবা-মায়ের করণীয়

–মো. আরিফুর রহমান*

সন্তান লালনপালনে বাবা-মা বা যেকোনো অভিভাবক অথবা শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সন্তানের জন্য তারা দায়িত্বশীল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সন্তানদের সম্পর্কে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের জিজ্ঞাস করবেন। পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে শরিয়তের ভেতরে থেকেই আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ও অবলম্বন করতে পারি। কার সন্তান কেমন হবে সেটা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। আদম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান কাবিল এবং নূহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র কিনআন সুপথ প্রাপ্ত হয়নি। অন্যদিকে আজরের পুত্র ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর কতই না প্রিয় বান্দা! সন্তান যেন সুপথ প্রাপ্ত হয় সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত লুকমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাঁর পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ স্মরণ রাখব।

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

"হে বৎস! নামায কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।"[৩৪]

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৩৫]

﴿وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

"পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৩৬]

পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষাকে আমরা মনে রাখবো। পাশাপাশি ভালো অভিভাবক হওয়ার জন্য আমরা নিয়মিত কিছু বিষয় অনুশীলন করবো।

**সন্তানের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করুন :** শিশু যখন তাদের বাবা-মায়ের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে পায় তখন তাদের আত্মবোধের বিকাশ শুরু করে। বাবা-মায়ের কণ্ঠস্বর, শরীরের ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ), কথার ধরন এবং কাজ অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে তাদের বিকাশমান আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে।

যতই ছোটো ছোটো অর্জন হোক না কেন সন্তানের প্রশংসা করতে হবে। এতে করে তারা ইতিবাচক কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। অন্যের ক্ষতি হয় না এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরে না যায় এমনসব ক্ষেত্রে বাচ্চাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা সক্ষম এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বিপরীতে সন্তানকে ছোটো করে বা হীন করে মন্তব্য করা বা একটি শিশুকে অন্যের সাথে প্রতিকূলভাবে তুলনা করলে তারা নিজেদেরকে মূল্যহীন ভাবতে শুরু করবে।

শিশুদের ছোটোখাটো ভুলে নেতিবাচক মন্তব্য করা এড়িয়ে চলুন। "কী বোকা তুমি?", "তোমার দ্বারা কিছুই হবে না" বা "ঐ বাড়ির ছেলেটাকে/মেয়েকে দেখো কত সুন্দরভাবে কাজ করে, কত ভালো লেখাপড়া করে"– এই ধরনের মন্তব্য শারীরিক আঘাতের মতোই ক্ষতি করে বা তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এই ধরনের মন্তব্য শিশুদের জন্য মারণাস্ত্রের

* *লেখক; প্রোগ্রাম ম্যানেজার- আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ।*

[৩৪] *সূরা লুকমা-ন : ১৭।*

[৩৫] *সূরা লুকমান : ১৮।*

[৩৬] *সূরা লুকমান : ১৯।*

আঘাতের মতই। এ রকম তুলনা থেকে বিরত থাকবেন।

শিশুর সাথে কথা বলার সময় বাবা-মা বা শিক্ষক শব্দচয়নে সাবধান এবং সহানুভূতিশীল হবেন। আপনার বাচ্চাদের জানতে দিন যে সবাই ভুল করে এবং আপনি এখনও তাদের ভালোবাসেন, এমনকি আপনি তাদের নির্দিষ্ট কিছু আচরণ পছন্দ না করলেও সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করবেন।

আপনি কি কখনও এক দিনে আপনার বাচ্চাদের প্রতি কতবার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান তা চিন্তা করেছেন? আপনি নিজেকে প্রশংসা করার চেয়ে অনেক বেশি সমালোচনা করুন। এমন একজন বস যিনি ভালো উদ্দেশ্যে হলেও আপনার সাথে নেতিবাচক দিকনির্দেশনার সাথে আচরণ করেন, সেই বস সম্পর্কে আপনি কেমন বোধ করবেন? নিশ্চয়ই নেতিবাচক বা ভীতিকর বা ঘৃণামিশ্রিত? এবার ভাবুন তো আপনার শিশুসন্তান আপনার নেতিবাচক কথাবার্তা কেমনভাবে নিবে?

শিশুদের ভালো কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য আরও কার্যকর পদ্ধতি হলো তাদেরকে ইতিবাচকভাবে বলা বা প্রশংসা করা। যেমন- আপনার শিশুকে বললেন, "তুমি বন্ধুদের নিয়ে মসজিদে গিয়েছিলে জামা'আতে নামায পড়তে আমি অনেক খুশি হয়েছি", "তুমি জিজ্ঞাসা না করেই তোমার বিছানা তৈরি করেছো– এটি দারুণ হয়েছে!" অথবা "তোমাকে তোমার বোনের সাথে খেলতে দেখছিলাম এবং তুমি খুব ধৈর্যশীল ছিলে।" "পড়ালেখা শেষ হবার পর তুমি নিজেই বইগুলো ব্যাগে রেখেছো-কী অসাধারণ কাজ করো তুমি!" এই কথাগুলো বারবার তিরস্কারের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদে ভালো আচরণকে উৎসাহিত করতে আরও বেশি কাজ করবে। মনে রাখবেন, শব্দচয়ন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিদিন প্রশংসা করার জন্য কিছু না কিছু খুঁজে বের করুন। পুরস্কার প্রদানে উদার হোন– আপনার ভালোবাসা, আলিঙ্গন এবং প্রশংসা বিস্ময়কর কাজ করতে পারে এবং এগুলো পুরস্কারের চেয়ে কম নয়। শিগগিরই আপনি দেখতে পাবেন, আপনি যে আচরণটি তাদের মধ্যে দেখতে চান তার চেয়ে তারা ভালো করছে।

**বাড়িতে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করুন :** প্রতিটি বাড়িতে শৃঙ্খলা আবশ্যক। শৃঙ্খলার লক্ষ্য হলো বাচ্চাদের গ্রহণযোগ্য আচরণ বেছে নেয়া এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শিখতে সাহায্য করা। দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেড়ে উঠতে তাদের সেই সীমাগুলোর প্রয়োজন।

বাড়িতে নিয়মরীতি (হাউজ রুলস্) স্থাপন করা বাচ্চাদের আপনার প্রত্যাশা কী তা বুঝতে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বিকাশে সহায়তা করে। কিছু নিয়ম এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেমন- হোমওয়ার্ক না হওয়া পর্যন্ত কোনো টিভি/মোবাইল দেখা চলবে না। প্রার্থনা/নামায না পড়লে খাওয়া-দাওয়া নেই। বাড়িতে কোনো মারামারি চলবে না। নাম ধরে ডাকা যাবে না বা অপমান করা নিষিদ্ধ। বাড়িতে আরও কিছু নিয়ম চালু করা যেতে পারে। যেমন- হাতের লেখা পর পর তিন দিন শেষ না করে টিভি/মোবাইল দেখতে বসলে আগামী দশ দিনের জন্য তোমার টিভি/মোবাইল দেখা নিষেধ। পর পর তিনদিন কোনো নিয়ম ভঙ্গ করলে আগামী এক মাসে তোমার জন্য বেড়াতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকবে। কোন কাজগুলো করা যাবে কোন কাজগুলো করা যাবে না তার একটি সীমা নির্ধারণ করুন। এই সব নিয়ম সন্তানদের দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা মেনে চলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

**বাচ্চাদের সময় দিন :** পারিবারিক খাবারে বাবা-মা এবং বাচ্চাদের একত্রিত হওয়া প্রায়শই কঠিন হয়, একসাথে মানসম্পন্ন সময় উপভোগ করুন। বাচ্চারা এটাই সব থেকে পছন্দ করবে। সকালে ২০ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠুন যাতে আপনি আপনার সন্তানের সাথে প্রাতঃভ্রমণে যেতে পারেন এবং রাতের খাবারের পরে একসাথে হাঁটতে পারেন। যে বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী মনোযোগ পায় না তারা প্রায়শই খারাপ আচরণ করে কারণ তারা নিশ্চিত যে তাদের প্রতি বাবা মা লক্ষ্য রাখেন না।

অনেক অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের একসাথে সময় নির্ধারণ করাকে ফলপ্রসূ মনে করেন। একসাথে থাকার

জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি 'বিশেষ রাত' তৈরি করুন এবং আপনার বাচ্চাদের কীভাবে সময় কাটাতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। সন্তানদের সাথে যোগাযোগ রাখার অন্যান্য উপায় বের করুন। আপনার বাচ্চার লাঞ্চবক্সে একটি নোট বা বিশেষ কিছু রাখুন। নোট হতে পারে মটিভেশনাল উক্তি। অনুপ্রেরণামূলক বা সন্তানের কোনো ভালো কাজের প্রশংসাসূচক।

ছোটো বাচ্চাদের তুলনায় কিশোর/কিশোরীরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে কম মনোযোগ পায়। যেহেতু বাবা-মা এবং কিশোর-কিশোরীদের একত্র হওয়ার সুযোগ কম, তাই বাবা-মায়ের উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাতে তাদের কিশোর-কিশোরীরা পারিবারিক কার্যকলাপে কথা বলার বা অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আপনি যদি একজন কর্মজীবী পিতা কিংবা মাতা হন তবে অপরাধবোধ করবেন না। আপনি কৃষক হোন বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হোন সে পরিচয় দিতে আপনার সন্তান যেন লজ্জাবোধ না করে সেই শিক্ষা তাকে দিন। সমস্ত হালাল পেশাকে ভালোবাসুন। সন্তানকে সেই শিক্ষা দিন।

**একজন অনুকরণীয় আদর্শ হোন :** ছোট বাচ্চারা তাদের বাবা-মাকে দেখে কীভাবে কাজ করতে হয় সে সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে। তারা যত ছোট, তারা আপনার কাছ থেকে তত বেশি শিক্ষা নেয়। আপনি আপনার সন্তানের সামনে অন্যকে আঘাত করার আগে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনি বই পড়লে আপনার সন্তান পড়তে চাইবে। আপনি প্রার্থনা করলে আপনার সন্তান তো সে দিকে ঝুঁকবেই। আপনি কি চান আপনার সন্তান যখন রাগান্বিত হয় আপনি যেমন আচরণ করেন সে তখন সে রকম আচরণ করুক? আপনি যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন করেন আপনার সন্তানও সেটা অনুশীলন করবে। সচেতন থাকুন কারণ ক্রমাগত আপনার বাচ্চারা আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিশুরা অন্যকে মারধর করে বা গালমন্দ করে তারা সাধারণত বাড়িতে এই রকম একটা পরিবেশ থেকে সেগুলো শিখেছে। বাড়িতে সে তার বাবা-মা বা অন্যদের মাঝে এমনটি দেখেছে।

আপনার বাচ্চাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে চান তার আদর্শ তৈরি করুন। যেমন- সম্মান, বন্ধুত্ব, সততা, দয়া, সহনশীলতা। নিঃস্বার্থ আচরণ প্রদর্শন করুন। পুরস্কারের আশা না করে অন্য লোকদের জন্য কিছু করুন। ধন্যবাদ প্রকাশ করুন এবং প্রশংসা করুন। সর্বোপরি বাচ্চাদের সাথে এমন আচরণ করুন যেভাবে আপনি আশা করেন যে, অন্য লোকেরা আপনার সাথে এই আচরণ করবে।

সন্তানদের কাজ করে দেখাতে হবে। শুধু আদেশ করবেন এমনটি নয়। বিছানা বিছানোর সময় তাকে সাথে নিয়ে বলবেন, চলো বিছানাটা ঠিক করতে তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে। শেখানোর সেরা উপায় হলো তাদের দেখানো।

মানুষ একটি বিশেষ প্রজাতি কারণ আমরা অনুকরণ করে শিখতে পারি। আমরা অন্যের ক্রিয়াকলাপ অনুলিপি করতে, সেগুলো বুঝতে এবং সেগুলোকে আমাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। শিশুরা, বিশেষ করে, তাদের বাবা-মা যা করে তা খুব মনোযোগসহকারে দেখে।

**যোগাযোগকে অগ্রাধিকার হিসাবে নিন :** কোনো কিছু জানতে বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো ব্যাখ্যা চায় এবং এই ব্যাখ্যা তাদের প্রাপ্য। যদি আমরা ব্যাখ্যা করার জন্য সময় না নেই, তাহলে বাচ্চারা আমাদের মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তাদের কোনো ভিত্তি আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। যে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের সাথে যুক্তি তুলে ধরে সে বাবা-মা তাদের বুঝতে এবং শিখতে সহায়তা করে।

আপনাদের প্রত্যাশা পরিষ্কার করুন। যদি কোনো সমস্যা হয় তা বর্ণনা করুন, আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন এবং আপনার সন্তানকে আপনার সাথে একটি সমাধানে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কাজের পরিণতি অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না। পরামর্শ দিন এবং পছন্দ প্রস্তাব করুন। আপনার সন্তানের পরামর্শের জন্যও খোলা মনে থাকুন। আলোচনা করুন। মনে রাখবেন, যে বাচ্চারা সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে তারা সেগুলো সম্পাদন করতে আরও অনুপ্রাণিত

হয়। নমনীয় হোন এবং আপনার অভিভাবকত্বের ধরন সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ইচ্ছুক হোন।

আপনি যদি প্রায়শই আপনার সন্তানের আচরণ দ্বারা 'হতাশ' বোধ করেন, তাহলে আপনার অবাস্তব প্রত্যাশা রয়েছে। অভিভাবকরা যারা 'উচিত' (উদাহরণস্বরূপ- "আমার বাচ্চাকে এখনই প্রশিক্ষিত হওয়া উচিত", "এখনই এই কাজটি শেখা উচিত") মনে করেন তারা এই বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করতে পারেন, অন্যান্য পিতামাতা বা শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে সহায়তা নিতে পারেন।

বাচ্চাদের পরিবেশ তাদের আচরণের উপর প্রভাব ফেলে, তাই আপনি পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম হতে পারেন। আপনি যদি আপনার দুই বছর বয়সি বাচ্চার প্রতি ক্রমাগত 'না' বলতে লক্ষ্য করেন তবে আপনার চারপাশের পরিবর্তন করার উপায়গুলো সন্ধান করুন। এটি উভয়ের জন্য কম হতাশার কারণ হবে।

আপনার সন্তানের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনাকে ধীরে ধীরে আপনার অভিভাবকত্বের ধরন পরিবর্তন করতে হবে। সম্ভাবনা হলো, আপনার সন্তানের জন্য এখন যা কাজ করে তা এক বা দুই বছরের মধ্যে কাজ করবে না। কিশোর-কিশোরীরা অনুকরণীয় আদর্শের জন্য তাদের পিতামাতার থেকে সমবয়সিদের প্রভাব বেশি। কিন্তু আপনারা কিশোর-কিশোরীদের আরও স্বাধীনতা দিন। তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। চাপিয়ে দিবেন না। তাদের সাথে একটি কাজের ভালোমন্দ দিক আলোচনা করুন। তাদেরকে কোনো একটি কাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিজেদেরই বের করতে বলুন। তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগান।

**আপনার ভালোবাসা নিঃশর্ত এটা প্রমাণ করুন :** একজন অভিভাবক হিসাবে আপনি আপনার সন্তানদের সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের জন্য দায়ী। আপনার সন্তান আপনার পরামর্শ কীভাবে গ্রহণ করে তা নির্ভর করবে আপনি কীভাবে আপনার সংশোধনমূলক পথপ্রদর্শন করেন তার উপর।

যখন আপনি সন্তানের মুখোমুখি হন তখন দোষ দেওয়া, সমালোচনা করা বা দোষ খুঁজে পাওয়া এড়িয়ে যান যা আত্মসম্মানে আঘাত করে এবং বিরক্তির কারণ হতে পারে। পরিবর্তে আপনার বাচ্চাদের শাসন করার সময়ও যত্নের সাথে উৎসাহিত করার চেষ্টা করুন। যাই হোক না কেন আপনার ভালোবাসা তাদের সাথে রয়েছে– এটা নিশ্চিত করুন। তাদেরকে বুঝান, আপনি পরের বার আরও ভালো চান এবং ভালোটা আশা করেন।

**একজন অভিভাবক হিসাবে আপনার নিজের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো জানুন :** আপনি একজন অপূর্ণ পিতামাতা-এটা মনে রাখতে হবে। কারও সমস্ত আশা পূর্ণ হয় না। যেভাবে আপনি চান সেভাবে নাও হতে পারে। পরিবারের অভিভাবক হিসেবে আপনার শক্তি এবং দুর্বলতা রয়েছে। আপনার সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিন "আমি তোমার প্রতি প্রেমময় এবং আন্তরিক।" আপনার দুর্বলতাগুলো নিয়ে কাজ করার শপথ করুন "আমাকে শৃঙ্খলার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।" নিজের, আপনার স্ত্রী এবং আপনার বাচ্চাদের জন্য বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কাছে সমস্ত উত্তর থাকতে হবে না– নিজেকে ক্ষমা করুন।

অভিভাবকত্বকে (প্যারেন্টিং) পরিচালনাযোগ্য করার চেষ্টা করুন। সব কিছু একবারে সমাধান করার চেষ্টা করার পরিবর্তে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রগুলোকে নির্দিষ্ট করুন। আপনি যখন ব্যর্থ তখন স্বীকার করুন। মাঝে মাঝে শাসকরূপী অভিভাবকত্ব থেকে বের হয়ে এমন কিছু করুন যা আপনাকে খুশি করবে।

নিজের চাহিদার প্রতি মনোনিবেশ করা আপনাকে স্বার্থপর করে তোলে না। এর সহজ অর্থ হলো আপনি আপনার নিজের মঙ্গল সম্পর্কে যত্নশীল, যা আপনার সন্তানদের জন্য অণুকরণীয় আদর্শ হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

**অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় জেনে নেওয়া যাক :** অভিভাবকত্ব সহজ নয়। ভালো বাবা-মা হওয়া কঠিন কাজ। কী করলে আপনারা ভালো বাবা-মা হতে পারবেন?

একজন ভালো বাবা-মা হলেন এমন একজন যিনি সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেন। ভালো পিতামাতাকে শুধু পিতামাতার কর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় না বরং তাদের অভিপ্রায় দ্বারাও বিচার করা হয়ে থাকে।

একজন ভালো পিতামাতাকে পারফেক্ট হতে হবে না। কেউ পারফেক্ট নয়। কোনো শিশুই পারফেক্ট নয়। আমরা যখন আমাদের প্রত্যাশা নির্ধারণ করি তখন এটা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

সফল অভিভাবকত্ব মানে পরিপূর্ণতা অর্জন নয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমাদের সেই লক্ষ্যে কাজ করা উচিত নয়। প্রথমে নিজেদের জন্য উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন এবং তারপর সন্তানদের জন্য। পিতামাতা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রোল মডেল (অনুকরণীয় আদর্শ) হিসেবে কাজ করে।

কীভাবে একজন ভালো অভিভাবক হবেন, ভালো অভিভাবকত্বের দক্ষতা এবং খারাপ অভিভাবকত্ব এড়ানোর জন্য এখানে কয়েকটি ভালো প্যারেন্টিং টিপস রয়েছে। এগুলো দ্রুত বা সহজে অর্জন করা যায় না। সম্ভবত কেউই সব সময় সব করতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি এই অভিভাবকত্বের পরামর্শ নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, যদি আপনি কিছু সময়ের জন্য এইগুলোর কিছু অংশ করতে পারেন, আপনি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

**আপনি আপনার সন্তানের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হোন :** আপনার সন্তানকে বুঝতে দিন আপনি তাদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে তাদের পাশে আছেন। একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনার সন্তানকে সমর্থন করুন এবং গ্রহণ করুন। আপনার সন্তানের মেধা বিকাশের জন্য একটি উষ্ণ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবেন আপনি।

***যে সব বাবা মা শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেন, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন সেই সব সন্তান আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, তাদের সামাজিক দক্ষতার বিকাশ হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রবণতা থাকে।***

**আপনার নিজের শৈশবকে প্রতিফলিত করুন :** আমরা অনেকেই আমাদের পিতামাতার থেকে নিজের সন্তানদের জন্য আলাদা পিতামাতা হতে চাই। এমনকি যারা শৈশবে ভালোভাবে লালিত পালিত হয়েছে এবং একটি সুখের শৈশব ছিল সেটাও বিবচনা না করে ভিন্ন জগতের পিতামাতা হতে চাই। আমাদের নিজের শৈশবকে প্রতিফলিত করা হলো ভালো অভিভাবকত্বের প্রথম ধাপ। আপনি যে জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে চান সেগুলো নোট করুন এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে এটি ভিন্নভাবে করবেন তা ভাবুন। পরের বার যখন এই সমস্যাগুলো আসবে তখন সচেতন হওয়ার চেষ্টা করুন এবং আপনার আচরণ পরিবর্তন করুন।

আপনি যদি প্রথমে সফল না হন তবে হাল ছেড়ে দেবেন না। সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি সচেতনভাবে পরিবর্তন করার জন্য একজনের প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন।

**আপনার অভিভাবকত্বের লক্ষ্যটি মনে রাখুন :** সন্তান লালনপালনে আপনার লক্ষ্য কী? আপনি আসলে কী চান এর মাধ্যমে? এই বিষয়গুলো আপনার মনে রাখতে হবে। আপনি যদি বেশিরভাগ পিতামাতার মতো হয়ে থাকেন তবে আপনি চান আপনার সন্তান স্কুলে ভালো রেজাল্ট করুক, সৃজনশীল হোক, দায়িত্বশীল এবং স্বাধীন হোক, শ্রদ্ধাশীল হোক, আপনার এবং অন্যদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক উপভোগ করুক, যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল হোক সুখী, স্বাস্থ্যকর এবং জীবন পরিপূর্ণ হোক। এখন প্রশ্ন হলো– সন্তানের জন্য আপনি সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনে কতটা সময় ব্যয় করে থাকেন?

আপনি যদি বেশিরভাগ পিতামাতার মতো হন তবে আপনি সম্ভবত দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান আপনার রোজগার নিয়ে। অর্থ আয়ের কাজে সময় পার করে দেন।

আপনি যা কিছু করছেন, যে সম্পত্তি অর্জন করছেন তা হয়তো কেবল আপনার সন্তানদের জন্যই। তাহলে শুধু সম্পত্তি কেন? সন্তানকে একটি ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ করে নিতে পারেন। দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে আপনার ভূমিকা মুখ্য। সন্তানকে সময় দিন, আপনিও সময় নিন। ❑

# গাভীর একটুকরো গোশ্‌তে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের এক বিস্ময়কর ঘটনা!

**–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ***

"গাভী"-এর আরবী প্রতিশব্দ بقرة (বাক্বারাহ্)। কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে বড়ো সূরাটিতে এক রহস্যময় গাভীর বর্ণনা এসেছে। তাই এ সূরাটির নামকরণও করা হয়েছে– "سورة البقرة" (সূরাতুল বাক্বারাহ্)। এটি পবিত্র কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সূরা। সূরাটি মাদানি (মদিনায় অবতীর্ণ হওয়া) সূরা। এ সূরায় গাভীর রহস্যময় যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে নিম্নে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের আলোকে তা তুলে ধরা হলো–

বনি ইসরাঈলের এক ধনী লোক ছিল। যার কোনো সন্তান ছিল না। তার উত্তরাধিকারী ছিল এক ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্পত্তি দ্রুত পাওয়ার লোভে সে তার চাচাকে হত্যা করে। গভীর রাতে গ্রামের কোনো এক লোকের দরজায় রেখে তার উপর হত্যার অপবাদ দেয়। এতে গ্রামবাসী দু'দলে বিভক্ত হয়ে মারামারি ও খুনাখুনির উপক্রম হয়। এ সময়ে কোনো এক জ্ঞানী লোক তাদেরকে বললো– তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) বিদ্যমান থাকতে তোমরা মারামারি ও খুনাখুনি করবে কেন? জ্ঞানী লোকটির কথা শুনে এবার তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলো।

ঘটনাটি শুনে মূসা (আলাইহিস সালাম) বনি ইসরাঈলদের বললেন– "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ দিয়েছেন (এ জবাই কৃত গাভী দ্বারাই তোমাদের সমস্যার সমাধান করা হবে), তারা বলল– তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন– আমি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই সে জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩৭]

ইহুদীরা যখন বুঝতে পারলো যে, গাভী জবাই করার আদেশ (আল্লাহ প্রদত্ত) সত্য এবং অবশ্য পালনীয়, (তারা ছিল– গো-বৎস পূজারী। সুতরাং) তারা তখন বিভিন্ন রকমের তালবাহানা শুরু করলো। (গাভী যেন জবাই করতে না হয় সেজন্য তারা অভদ্রভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে) তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলল– "তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো যে, কোন ধরনের গাভী জবাই করতে হবে? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, সেই গাভী বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্ক বা শাবকও নয়; বরং তা হবে মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যেমন আদেশ পেয়েছ তেমনই পালন করো।"[৩৮]

প্রথম নির্দেশ পাওয়ার পর ইহুদীরা যদি কোনো একটি গাভী জবাই করে দিত তাহলেই নির্দেশটি পালন করা তাদের জন্য অনেক সহজ হত। কিন্তু না ইহুদীরা তালবাহানা করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিষয়টিকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলল। এবার তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলল–

"তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের গাভীটির রং কেমন হবে তা বর্ণনা করেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, সে গাভীটির রং হবে গাঢ় হলুদ যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।"[৩৯]

এই রং-এর এরকম গাভী সচরাচর দেখা যায় না। এরকম গাভী পাওয়া বড়ই কঠিন! ইহুদীরা এবার আর প্রশ্ন না করে এরকম একটি গাভী খুঁজতে লাগল।

বনি ইসরাঈলের মাঝে একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তার একটি গাভী ছিল। লোকটি মারা যাওয়ার সময় তার স্ত্রীর কাছে শিশু সন্তানের জন্য এ গাভীটি রেখে যান। ছেলেটি বড়ো হলে তার মা তাকে বলল– তোমার বাবা তোমার জন্য একটি গাভী রেখে গেছেন। গাভীটি মাঠে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছে। তুমি মাঠে গিয়ে এই বলে তাকে ডাকো যে, হে ইব্‌রাহীম!

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[৩৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬৭।*

[৩৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬৮।*

[৩৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬৯।*

ইসমা'ঈল, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রভূ! আপনি আমাকে আমার গাভীটি প্রদান করুন! তখন তুমি গাভীটি পেয়ে যাবে। গাভীটির নিদর্শন হলো– তা হবে গাঢ় হলুদ বর্ণের খুবই চমৎকার গাভী!

যুবকটি মাঠে গিয়ে দেখলো গাভীটি জমিনে বিচরণ করছে। মায়ের নির্দেশ পালন করার সাথে সাথে গাভীটি তার সামনে চলে এলো। দেখা গেল– মায়ের বর্ণিত নিদর্শন ও গুণাবলী এই গাভীটির মাঝে বিদ্যমান।

এবার যুবকটি গাভীটি নিয়ে মায়ের কাছে চলে এলো। মা তাকে বলল– তুমি তো গরীব-অসোহায়। তাই আমি মনে করছি, তুমি এটি বিক্রি করে ফেলো।

বনি ইসরাঈলের উপর গাভী জবাইয়ের নির্দেশ হলে তারা গাভী খুঁজতে খুঁজতে যুবকের নিকট এসে তার গাভীটি দেখল। তারা এই একটিমাত্র গাভীই পেল যা হুবহু মহান আল্লাহর হুকুম মোতাবেক। তাই তারা গাভীটি ক্রয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করল। যুবকটি তখন তাদেরকে বলল– আল্লাহ তা'আলার শপথ! এই গাভীর চামড়াপূর্ণ স্বর্ণের কম মূল্যে আমি তা বিক্রি করব না। সুতরাং তারা বাধ্য হয়ে চামড়াপূর্ণ স্বর্ণ মূল্যেই গাভীটি ক্রয় করে এবং জবাই করে।

তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশ মতো জবাইকৃত গাভীর একখণ্ড গোশত দিয়ে ঐ মৃতদেহটির উপর আঘাত করে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটি প্রাণ ফিরে পায়। লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। উপস্থিত সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করে কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বলল– আমার এ ভ্রাতুষ্পুত্রই আমাকে হত্যা করেছে। একথা বলেই লোকটি মারা যায়। এই ঘটনার মাধ্যমে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা হলো। হত্যাকারীকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত কোন সম্পদ দেওয়া হলো না।

আল্লাহ, যিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের সকল জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর নাম বা পরিচয় মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে ওয়াহীর মাধ্যমেই জানিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু এ গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে তিনি ইহুদীদের গো-বৎস পূজার প্রচলন ও এ ধরনের মানসিকতায় আঘাত করেন। একইভাবে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে একটি বড়ো বিবাদেরও নিষ্পত্তি ঘটান। গাভীর মালিককে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী বানিয়ে দেন।

এ ঘটনার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানালেন যে, যেকোনভাবে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করান যাতে মানুষ হৃদয়াঙ্গম করতে পারে।

আমাদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্মসমূহ আল্লাহ তা'আলা জানেন ও দেখেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় করে আমাদের সকল অপকর্ম বর্জন করা উচিত। ❑

## উদাত্ত আহ্বান

**জমঈয়তে আহলে হাদীস** এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

## ভ্রমণবৃত্তান্ত

# এই সেই বিলাত

–প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

*[এই সেই বিলাত প্রবন্ধটি ৬৪ বর্ষ ১৩-১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুদ্রণজনিত ও তথ্যগত কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় তা সংশোধনকরত পুনঃমুদ্রিত হলো।]*

কনফারেন্স উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণকালে বিভিন্ন রকমের খাবার, অনেক মানুষের সাথে পরিচয়, নতুন জায়গা ও পরিবেশের অনুভূতি এবং চমৎকার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান স্মৃতিতে জমা আছে। বিশ্ব মনোরোগ বিষয় সংগঠন (ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন)-এর কংগ্রেস জার্মানির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত দেশটির রাজধানী ঐতিহাসিক শহর বার্লিনে ৮ থেকে ১২ অক্টোবর-২০১৭ অনুষ্ঠানে যোগদান করি। কংগ্রেসে যোগদান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে আমরা বেশ কয়েকজন ডাক্তার ফ্যামিলিসহ ইউরোপ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেই। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে আমরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ইউরোপ সফর করি। আমাদের গ্রুপটি চেকের রাজধানী প্রাগ, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, মিউনিখ (জার্মানির বিখ্যাত শহর), ফ্রাঙ্কফোর্ট (জার্মানির আরেকটি বিখ্যাত শহর) এবং বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস ভ্রমণ করে।

১৬ অক্টোবর ২০১৭ সাল ব্রাসেলস থেকে আমি ও আমার স্ত্রী লন্ডনের দিকে যাত্রা করি আকাশপথে। আমাদের যাত্রাটি ছিল ব্রাসেলস এয়ারলাইন্সে, সে জন্য আমরা বিকাল পৌনে তিনটায় ব্রাসেলস এয়ারপোর্টে গেলাম। আকাশযানটি বিকাল পৌনে পাঁচটায় আমাদেরকে নিয়ে উড়াল দিলো এবং লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পাঁচটা পাঁচ মিনিটে অবতরণ করল। আমাদের বড়ো মেয়ে ডা. জুলফিয়া জেরীন ও তার স্বামী জয়নাল আবেদিন ইস্ট লন্ডনে বসবাস করে। মেয়ে ঐখানে সরকারি হাসপাতালে চাকরি করে এবং তার স্বামী সলিসাইটর (ল-ইয়ার) হিসেবে চাকরিরত। বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ প্রশংসনীয়। ফলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজগুলো শেষ হয় যা আমাদের দেশের বেলায় চিন্তাও করা যায় না। উল্লেখ্য যে, গোটা ইউরোপের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আচরণ প্রশংসনীয়। যথাসময়ে মেয়ে ও মেয়ের জামাই প্রচণ্ড শীত বিধায় দু'টি ওভারকোট নিয়ে বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিল। ট্যাক্সিতে ১৬০ মাইল পথ পেরিয়ে দু'ঘন্টায় ইস্ট লন্ডনের ম্যানর পার্ক এলাকায় অবস্থিত ২৫০ নম্বর শেরিংহাম এভেনিউতে তাদের বাসায় পৌঁছলাম।

মনে পড়ে– ১৯৬৮ সালে এস. এস. সি পরীক্ষার পর প্রায় তিন মাস অবসরের সময়ে খোন্দকার ইলিয়াস-এর লেখা দু'টি বই "ভাসানী যখন ইউরোপে" এবং "কতো ছবি কতো গান" পড়েছিলাম। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন স্বভাবগত পোশাক লুঙ্গী, পাঞ্জাবী, সেন্ডেল ও তালপাতার আঁশ দিয়ে তৈরি টুপি পরে। তার সফরসঙ্গীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খোন্দকার ইলিয়াস। তিনি আমার ইন্টার মেডিয়েটের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। তেষট্টি বছর পূর্বের ইউরোপ ও বিলাত বর্তমানে চিত্র পাল্টিয়েছে। ঢাকার জগন্নাথ সরকারী কলেজে (১৯৬৮-৭০) দু'বছর ইন্টারমেডিয়েটের যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের পাঠ্য ছিল অধ্যাপক আব্দুল হাই-এর লেখা "বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন" বইটি। তিনি ১৯৫০ সালে পিএইচডি করতে বিলেতে গিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত যুক্তরাজ্য (বিলেত)। দেশটি ৪টি রাজ্য ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ড-এর সমন্বয়ে গঠিত। সবচেয়ে বড়ো ও জনবহুল রাজ্যটির নাম ইংল্যান্ড, যা দেশটির দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত, পশ্চিম অংশে আছে ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং উত্তরে আছে স্কটল্যান্ড। দেশটিকে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল ও আইরিশ সাগর ঘিরে রেখেছে। দেশটি চ্যানেল টানেলের মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত। ইংলিশ চ্যানেলটি দক্ষিণ ইংল্যান্ডকে উত্তর ফ্রান্স থেকে আলাদা করেছে, যা উত্তর

* *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

সাগরের দক্ষিণ অংশের সাথে আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযোগ স্থাপন করেছে। এটি হলো বিশ্বের ব্যস্ততম জাহাজ চলাচলের পথ। চ্যানেলটির দৈর্ঘ্য ৩৫০ মাইল ও প্রস্থ সর্বোচ্চ ১৫০ মাইল। কিং অব চ্যানেল (King of Channel) নামে খ্যাত বাংলাদেশের ব্রজেন দাশ, যার জন্ম বিক্রমপুরে ১৯২৭ সালে, তিনি প্রথম এশিয়ান হিসেবে এই ইংলিশ চ্যানেলটি (সর্বনিম্ন ২১ মাইল প্রস্থ) সাঁতরিয়ে পাড়ি দেন ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বার। তিনি শুরুতে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে স্রোতের বিপরীতে সাঁতারের অনুশীলন করতেন। বর্তমানে আমরা আমাদের সেই জীবন্ত বুড়িগঙ্গাকে নর্দমায় পরিণত করে রেখেছি।

বিলেতে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রপ্রধান। তখন তাঁর বয়স ৯১ বছর। স্বামীর নাম প্রিন্স ফিলিপ। পূর্বকালে ভারত উপমহাদেশের জনগণ বিলাত ফেরত বলতে বিদেশ ফেরত বুঝেছেন। বিলেত শব্দটি আরবি ওয়ালাত শব্দ থেকে; ফারসি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় আরবি বর্ণ ওয়াও-এর উচ্চারণজনিত কারণে বিলায়ত হয়, পরে বাংলা উচ্চারণে বিকৃত হয়ে বিলাত বা বিলেত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আরবি ওয়ালাত শব্দের অর্থ ওলী বা গভর্নর শাসিত প্রদেশ বা দেশ। পূর্বে মিশর ও ইরানসহ বহুদেশ আরবদের ওয়ালাতভুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিকে ভারতীয় মুসলিমগণ পারস্য (ইরান) ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহকে বিলায়ত বলত। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে শব্দটি পালটিয়ে ভারতীয়দের কাছে বিলাত হয় ইংল্যান্ড বা ইউরোপ।

**ইংল্যান্ড (England) :** প্রাচীন উত্তর জার্মানীর এংগলেস (Angles) উপজাতীরা সেখান থেকে এসে বর্তমান ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে। ইংরেজিতে Angles (এংগলেস) পরিবর্তন হয়ে Engla (ইংলা) হয় এবং Land (ভূমি)-এর আগে Engla যোগ হয়ে দাঁড়ায় Engla + Land = England রাজ্য, যা বর্তমানে সবচেয়ে জনবহুল এবং যুক্তরাজ্যের (UK) বড়ো রাজ্য। এই ইংল্যান্ডের সাওদাম্পটন (Southampton) বন্দর থেকে ১০ এপ্রিল-১৯১২ সালে জগত বিখ্যাত প্রমোদ তরী টাইটানিক (ভ্রাম্যমান শহর) তিন হাজার ভ্রমণবিলাশ যাত্রী নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আটলান্টিক মহাসাগরে পানির নীচে বরফের পাহাড় (Ice-burge)-এর সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় এবং প্রায় অর্ধেক যাত্রী মারা যায়।

**লন্ডন (London) :** ৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সৈন্যরা টেমস নদীর (Thames to River) উত্তর পার্শ্বে দু'টি টিলা একত্রে বসবাসযোগ্য করে নাম দেয় Landinium এবং ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করতে থাকে। পরে Landinium শব্দটি ধীরে ধীরে London নাম ধারণ করে, যা বর্তমান যুক্তরাজ্যের (UK) রাজধানী।

**গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain) :** ৫ম শতাব্দীতে যখন রোমানগণ ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায় তখন থেকে উত্তর জার্মানী ও দক্ষিণ ডেনমার্ক থেকে উপজাতীয় Anglo-Saxon-গণ বর্তমান Great Britain-এ বসবাস শুরু করলে তাদেরকে ইংরেজ বলা হতো। ব্রিটেন শব্দটি এসেছে Britannia থেকে যা রোমানগণ নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্মের ৫২ বছর পূর্বে নাম দিয়েছিল। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস রাজ্য ২টি ইংল্যান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে নাম ধারণ করে গ্রেট ব্রিটেন।

**যুক্তরাজ্য (United Kingdoms) :** সংক্ষেপে UK (ইউ.কে) বলে তা গঠিত হয়েছে– ইংল্যান্ডে + স্কটল্যান্ড+ওয়েলস মিলে গ্রেট ব্রিটেন এবং পরে উত্তর আইয়ারল্যান্ড যুক্ত হয় ১৮০১ সালে। দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র এবং নাম হয়েছে আইরিশ রিপাবলিক। যুক্তরাজ্যের আয়তন হচ্ছে ৯৩,৬২৮ বর্গ মাইল (২,৪৪,১১০ বর্গ মিটার) এবং লোক সংখ্যা হলো ৬৬ মিলিয়নস। লোকেরা যুক্তরাজ্যকে এখন ব্রিটিশ বলে থাকে।

আমরা মাদাম তুসো মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়াক্স (মোম দিয়ে তৈরি) মিউজিয়াম হলো লন্ডনের মাদাম তুসো মিউজিয়াম। এটা ছাড়াও হংকং, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশেও মাদাম তুসো মিউজিয়াম রয়েছে।

এছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মিউজিয়াম ব্রিটিশ মিউজিয়ামও উল্লেখ করার মতো। ৯২ হাজার বর্গমিটার এই মিউজিয়ামে ৮ মিলিয়ন ঐতিহাসিক আইটেম রয়েছে। জাদুঘরটি ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা

হয়। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সাথে মিসরীয় সভ্যতারও বিশাল অংশ রয়েছে এখানে।

লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল রোডে বিখ্যাত ইস্ট লন্ডন মসজিদটি মুসলিম সেন্টার ও মারিয়াম সেন্টারের সাথে সম্মিলিতভাবে যুক্ত। শত বছর পূর্বে নির্মিত এই মসজিদটিতে ৭ হাজার মুসল্লি একসাথে সলাত আদায় করতে পারেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান খতিব হলেন নোয়াখালীর শাইখ আব্দুল কাইয়ুম। স্ত্রীসহ আমি ঐ মসজিদে দু'বার জুমু'আর সালাত আদায় করেছি। মসজিদটিতে জুমু'আর ২ খুৎবায় কুরআন হাদীসের আলোচনা স্থানীয় ভাষা ইংরেজিতে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, লন্ডনের অধিকাংশ মসজিদে জুমু'আর উভয় খুৎবা ইংরেজিতে দেয়া হয়। কোনো কোনো মসজিদে ইংরেজির পরে বাংলাও বলা হয় খুৎবাতে যদি বাঙ্গালী মুসল্লি থাকে। আল কুরআন একাডেমি লন্ডন-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ ইসলামী বইমেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজক কমিটির প্রধান এবং আল কুরআন একাডেমি লন্ডন এর চেয়ারম্যান, হাফেয মুনির উদ্দিন আহমদ উক্ত বইমেলা উদ্বোধন করেন। ক্যামব্রিজে জন্ম মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল (১৮৭৫-১৯৩৬) পবিত্র কুরআনের প্রথম ইংরেজিতে 'দি মিনিং অব দা গ্লোরিয়াস কুরআন' নামে অনুবাদ করেন।

রমযান মাসে ইতিকাফের জন্য এই মসজিদে লটারি করা হয়। সমগ্র যুক্তরাজ্যে ১৭৫০টি মসজিদ আছে। এর মধ্যে ১৫০টি হলো সালাফি (আহলে হাদীস) মসজিদ। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের চার ভাগের একভাগ হলো সালাফি (আহলে হাদীস)। লন্ডন হলো ইউরোপের বাণিজ্যিক রাজধানী ও বহু জাতির লোকের আবাসস্থল। লন্ডনের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ; তার মধ্যে মুসলিম সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ (১৪%)। আয়ারল্যান্ডে ১৮৫৬ সালে জন্ম বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ। ১৯৩৬ সালে তিনি দি জেনুইন ইসলাম নামে বইয়ের ১ম ভলিউমে লিখেন (যার বঙ্গানুবাদ), "আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে, যেভাবে আজকের ইউরোপবাসী ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষ করে বিলাত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"

নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি ও বার্ড অব অ্যাভন বা অ্যাভনের চারণকবি নামেও অভিহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্সপিয়ার গ্রামে স্কুল শিক্ষকের চাকরি করতেন। তার সেরা কীর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, জুলিয়াস সিজার ও রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ইত্যাদি। জন মিলটন কমনওয়েলথ অব ইংল্যান্ডের একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং অন্ধ ও দরিদ্র ছিলেন। মিলটন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি। আইজ্যাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ, গতির সূত্র ও ক্যালকুলাস প্রভৃতির আবিষ্কারক। বিখ্যাত এই পদার্থবিজ্ঞানী ১৬৪২ সালে বিলেতেই জন্ম নেন যে সালে ইতালির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পৃথিবী গোল-এর আবিষ্কারক গ্যালেলিও মারা যান। এই বিলেতে মিথ্যা বিবর্তনবাদ তত্ত্বের প্রবর্তক চার্লস রবার্ট ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালে এবং মৃত্যু ১৮৮২ সালে। তিনি ১৮৫৯ সালে অবৈজ্ঞানিক ডারউইনিস (Darwinison) তত্ত্ব নিয়ে বই লেখেন যা পরবর্তীকালে হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রত্যাখ্যান করেছে।

অক্টোবরে বাংলাদেশ ফ্যাশন কাউন্সিল ইউকে-এর উদ্যোগে লন্ডনের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র ক্যানারি ওয়ার্ক-এর ইস্ট উন্টার গার্ডেনে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ফ্যাশন উইক অনুষ্ঠিত হলো। বাংলাদেশের আটজন, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের পাঁচজন ও দুবাই থেকে একজন ডিজাইনার এতে অংশ নেন। লন্ডনের চায়না টাউনটি ওয়েস্ট মিনস্টারের সড়কে অবস্থিত। ১৯৫০ সালে চীনারা লন্ডনে অভিবাসন শুরু করে। তখনই চায়না টাউনের গোড়াপত্তন ঘটে। এখানকার অধিবাসীরা মূলত হংকং থেকে আগত। চায়না টাউনটিতে অসংখ্য খাবারের হোটেল, বেকারি ফুড, সুপার মার্কেট, শোপিসের দোকান রয়েছে। চীনাদের অন্যান্য চলমান ব্যবসার জন্য এলাকাটি বিখ্যাত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, চায়না টাউন পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে এক টুকর চীন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমরা লন্ডন শহর থেকে পশ্চিম দিকে ৬০ মাইল দূরে অক্সফোর্ড শায়ারে ১০৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে গেলাম। ট্রেনে সময় লাগলো দেড় ঘন্টা। যদিও আমাদের বাসস্থান মেনর পার্ক এলাকার শেরিংহ্যাম এভেনিউতে, তথাপি মেনর পার্ক পাতাল রেল স্টেশন দূরে বিধায় নিকটস্থ ইস্টহ্যাম পাতাল রেল স্টেশন ব্যবহার করতাম। উল্লেখ্য যে, লন্ডন শহরে ২৪৯টি পাতাল রেল স্টেশন আছে। এর মধ্যে ওয়াটারলো, ওয়েস্টহ্যাম, ভিক্টোরিয়া, অক্সফোর্ড সার্কাস, লন্ডন ব্রিজ, লিভারপুল স্ট্রীট, বেকার স্ট্রীট দেখার সুযোগ হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বহুজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে। পরিবেশটি চমৎকার। ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী আয়রন লেডি মার্গারেট থ্যাচার এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে কেমিস্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন করেন। সম্প্রতি রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সাং সুচিকে দেয়া ফ্রিডম অব অক্সফোর্ড সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নেন। লন্ডন শহরে অক্সফোর্ড এভিনিউ নামে শপিং সেন্টার আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রহিমাহুল্লাহ) এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে ইসলামের ইতিহাস– ওয়াহাবী আন্দোলন-এর উপর গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

**লন্ডন আই :** এটি ১৩৫ মিটার উঁচু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অবজারভেশন হুইল ২০০০ সালে স্থাপিত হয়। ধীরলয়ে ঘূর্ণায়মান লন্ডন আই'র সর্বোচ্চ স্থানটিতে অবস্থানকালে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি ব্রিটেনের রানীর বাড়ি উইন্ডসর ক্যাসলও দেখা যায়। প্রতিবার ঘূর্ণায়নকালে একসঙ্গে ৮০০ ব্যক্তি এতে উঠতে পারেন। আমরা টেমস (Themes) নদীতে রিভার ক্রুইজে প্রমোদ ভ্রমণ করি। তাছাড়া টেমস নদীর সুড়ঙ্গ পথে রেল ভ্রমণ করেছি।

লন্ডনে মোট তিন সপ্তাহ অবস্থান করে আমরা কাতার এয়ারওয়েজ বিমানে হিথ্রো থেকে দোহা বিমান বন্দরে আসি। অতঃপর কানেক্টিং ফ্লাইটে দোহা থেকে ঐ কোম্পানির অন্য বিমানে ঢাকায় ফিরে আসি।

**পুনশ্চঃ** বাংলাদেশ হতে পারে মুসলিম পর্যটকদের আগ্রহ স্থল। মিশর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশের মতো আমাদের দেশটি পর্যটন খাত থেকে বিপুল পরিমাণ আয় করতে পারে। সেজন্য বাংলাদেশকে মুসলিম বান্ধব টুরিজম বিকাশ ঘটাতে হবে এবং এটা সম্ভব। কারণ পৃথিবীতে ইসলামিক পর্যটন শিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মুসলিম ট্রাভেলার্স তো বটেই, অমুসলিম ট্রাভেলার্সও এতে আকৃষ্ট হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সরকারি বেসরকারি সংস্থা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমরা মনে করি। ❑

## আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন–

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবী করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরী জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

*(অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.)*

## বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

# রজব মাস : ভ্রান্ত ‘আমল থেকে সাবধান

**“রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।”** *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

**আরাফাত ডেস্ক :** পবিত্র রজব মাস সমাগত। আল্লাহ তা‘আলা বারো মাসের মধ্যে চারটি মাসকে আরবা‘আতুন হুরুম’ তথা সম্মানিত চারটি মাস বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

“নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি। তার মধ্যে রয়েছে চারটি সম্মানিত মাস।”[৪০]

এই চারটি সম্মানিত মাসের একটি হলো রজব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বারো মাসে বছর। তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি ধারাবাহিক : যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মহর্‌রম আর চতুর্থটি হলো রজব, যা জুমাদাল উখরা ও শা’বান মাসের মধ্যবর্তী মাস।[৪১]

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আশহুরে হুরুমের এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এসব মাসে ‘ইবাদতের প্রতি যত্নবান হলে বাকি মাসগুলোতে ‘ইবাদতের তাওফীক হয়। আর আশহুরে হুরুমে কষ্ট করে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারলে অন্যান্য মাসেও গুনাহ পরিহার করা সহজ হয়।[৪২] তাই আশহুরে হুরুমের অন্তর্গত রজব মাসের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া উচিত।

তবে শরিয়তের পক্ষ থেকে এ মাসের জন্য বিশেষ কোনো নামায, বিশেষ কোনো রোযা বা বিশেষ পদ্ধতির কোনো ‘আমলের হুকুম দেয়া হয়নি। তাই বাজারের অনির্ভরযোগ্য বই-পুস্তকে রজব মাস উপলক্ষ্যে বিশেষ নামায ও রোযার যেসব কথা পাওয়া যায় তা সবই ভিত্তিহীন। এ ধরনের মনগড়া ‘আমল দ্বারা এ মাসের ফযীলত লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।

রজব মাস সম্পর্কে আমাদের সমাজে লোকমুখে, ইন্টারনেটে এবং বিভিন্ন ইসলামিক বই-পুস্তকে উল্লেখিত কতিপয় য‘ঈফ ও ভিত্তিহীন কথা সম্পর্কে নিম্নে পর্যালোচনা পেশ করা হলো–

**১. রজব মাস সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি দুর্বল হাদীস :**

**ক)** “জান্নাতে একটি নহর আছে, যাকে বলা হয় রজব। যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি। যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন রোযা (সওম) রাখবে তাকে সেই নহরের পানি পান করতে দেয়া হবে।”

ইবনু হাজ্‌র (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবূল কাসেম আত্ তাইমী তার ‘আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব’ কিতাবে, হাফেয আসপাহানী বর্ণনা করেছেন ‘ফাযলুস সিয়াম’ কিতাবে, বাইহাক্বী ‘ফাযায়িলুল আওকাত’ কিতাবে। এটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটি দুর্বল। ইবনুল জাওযী ইলালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রে একাধিক অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তাই এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে বানোয়াট বলার মতো পরিস্থিতি নেই। এর আরও কয়েকটি সূত্র রয়েছে কিন্তু সেগুলোতেও একাধিক অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে।[৪৩]

**খ)** “আল্লা-হুম্মা বারিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শা‘বানা ও বাল্লিগনা রামাযান।”

“হে আল্লাহ! তুমি রজব ও শা‘বানে আমাদেরকে বরকত দাও। আর আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।”[৪৪]

হাদীসটি দুর্বল। এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম যায়িদাহ্ ইবনু আবূর রিকাদ। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী তার সুনান গ্রন্থে তার নিকট থেকে

---

[৪০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*
[৪১] *সহীহুল বুখারী- ২/৬৭২।*
[৪২] *আহকামুল কুরআন- জাসসাস, ৩/১১১; মা’আরিফুল কুরআন- ৪/৩৭২।*
[৪৩] *তাবয়ীনুল আজাব- ৯-১১ পৃ.; আল ই‘লালুল মুতানাহিয়া- ২/৬৫ পৃ.।*
[৪৪] *মুসনাদ আহমাদ- ১/২৫৯।*

একটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, এই ব্যক্তিকে আমি চিনি না। আর তিনি তার 'যুআফা' কিতাবে বলেন, মুনকারুল হাদীস। 'কুনা' গ্রন্থে বলেন, "তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার বর্ণিত কোনো হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।[৪৫]

**গ)** "রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের পরে রজব ও শা'বান ছাড়া অন্য কোনো মাসে রোযা (সওম) রাখেননি।"[৪৬]

হাফেয ইবনু হাজর বলেন, হাদীসটি মুনকার। কারণ এর সনদের ইউসুফ ইবনু 'আত্বিয়াহ্ নামক একজন রাবী রয়েছে; সে খুব দুর্বল।[৪৭]

**২. রজব মাস সম্পর্কে কয়েকটি জাল হাদীস :**

**ক)** "রজব মহান আল্লাহর মাস, শা'বান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মাতের মাস।" এটি জাল হাদীস।

হাফেয ইবনু হাজ্র আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এ হাদীসটি বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবূ বক্বর আন নাক্কাশ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। সে কুরআনের মুফাস্সির। কিন্তু লোকটি জাল হাদীস রচনাকারী এবং চরম মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। ইবনু দেহিয়া বলেন, এই হাদীসটি জাল।[৪৮] এছাড়াও উক্ত হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন ইবনু জাওযী তাঁর আল 'মাওযূয়াত' কিতাবে (২/২০৫-২০৬), ইমাম সানয়ানী 'মাওযূআত' কিতাবে (৬১ পৃ.) এবং সূয়ূতী তাঁর 'আল লাআলী আল মাসনূআহ' কিতাবে (২/১১৪)।

**খ)** কুরআনের মর্যাদা সকল যিক্র-আযকারের উপর, যেমন রজব মাসের মর্যাদা অন্যান্য মাসের উপর।" হাদীসটি বানোয়াট।

ইবনু হাজর আসকালানী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এই হাদীসটির সনদের রাবীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য একজন ছাড়া। তার নাম হলো সিকতী। আর এ লোকটিই বিপদজনক। কেননা, সে একজন বিখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী।[৪৯]

**গ)** রজব মাসে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা (সওম) রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার 'আমলনামায় একমাস রোযা (সওম) রাখার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, আর যে ব্যক্তি সাতটি রোযা (সওম) রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দিবেন।" হাদীসটি জাল।

এটিকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইবনু জাওযী 'আল মাওযূয়াত' কিতাবে (২/২০৬), সূয়ূতী 'আল লাআলী আল মাসনূআহ' কিতাবে (২/১১৫), শাওকানী 'আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুয়াহ' কিতাবে (১০০ পৃ., হা. ২২৮) এবং 'তাবয়ীনুল আজাব' কিতাবে (১৮ পৃ.)।

ঘ) "যে ব্যক্তি রজবের প্রথম তারিখে মাগরিবের সালাত আদায় করার পর বিশ রাকআত সালাত আদায় করবে, আর প্রতি রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ এবং সূরা আল ইখলা-স একবার করে পাঠ করবে এবং প্রতি দু'রাকআত পরপর সালাম ফিরিয়ে মোট দশ সালামে বিশ রাকআত পূর্ণ করবে, তোমরা কি জানো তার সওয়াব কি? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হিফাজত করবেন এবং তার পরিবার, সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততীকে হিফাজত করবেন, কবরের 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার করাবেন।" এটি একটি বানোয়াট হাদীস।[৫০]

**ঙ)** "যে ব্যক্তি রজব মাসে রোযা (সওম) রাখবে এবং চার রাকআত সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে তার নির্ধারিত আসন না দেখে মৃত্যুবরণ করবে না।"

হাদীসটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনু জাওযী 'আল মাওযূয়াত' কিতাবে (২/১২৪), শাওকানী 'আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়াহ' কিতাবে (৪৭ পৃ.) এবং 'তাবয়ীনুল আজাব' (২১ পৃ.)। *[আলবিদা' আল হাউলিয়া' থেকে সংকলিত]*

---

[৪৫] *তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফযলি রাজাব- ১২ পৃ.; আয যুয়াফাউল কাবীর- ২/৮১; তাহযীবুত তাহযীব- ৩/৩০।*
[৪৬] *বাইহাক্বী।*
[৪৭] *তাবয়ীনুল আজাব- ১২ পৃ.।*
[৪৮] *তাবয়ীনুল আজব- ১৩-১৫ পৃ.।*
[৪৯] *তাবয়ীনুল আজাব- ১৭ পৃ.।*
[৫০] *দ্রষ্টব্য : ইবনুল জাউযী, মাওযূয়াত- ২/১২৩; তাবয়ীনুল আজাব- ২০ পৃ.; আল ফাওয়াইদুল মাজমূয়াহ- ৪৭ পৃ., জাল হাদীস নং- ১৪৪।*

## সমাজচিন্তা

# ভ্যালেন্টাইনস ডে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

–মাক্বসুদুর রহমান*

**ভূমিকা :** ইংরেজী 'Love' বাংলা 'ভালোবাসা' ও আরবী (محبة) 'মাহাব্বাত' একটি হৃদয় ঘটিত কর্ম। পানাহার, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের মতো ভালোবাসা ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত আবার কখনো কঠিন নিষিদ্ধ হারাম কর্ম। এ নিষিদ্ধ কর্মের একটি হচ্ছে নারী ও পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা তথা অবৈধ প্রণয়। সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র (কথিত) করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু, ব্যভিচারের ঠিকাদারেরা এবং আন্তর্জাতিক বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার মাধ্যম, রংমহল, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনি রচনা করেছে অবৈধ প্রেম বৈধ করার বিভিন্ন আইনকানুন, তৈরি করেছে প্রেম প্রকাশ করার মতো স্মারক দিবস। "ভালোবাসা দিবস" এমনি একটি দিবস। একে ওদের ভাষায় 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বলে। মূলত খ্রিষ্ট ধর্মের লোকেরা এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

তবে বর্তমানে খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মুসলিম জাতিসহ গোটা বিশ্ব আজ এ দিবসের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে যে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোন আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে, সে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোনকে এ বিজাতীয় সংস্কৃতির পাপরুদ্ধ লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে ফিরে আসার আহ্বান নিয়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের বর্তমান চিত্র :** কয়েক বছর পূর্বে এদেশে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-এর আমদানি করে একটি তথাকথিত প্রগতিশীলদের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। প্রতিযোগিতার বাজারে কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না বলে পরের বছর থেকেই অন্যান্য পত্রিকাও এ দিবসের প্রচারণায় নামে। এ দিবসটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও পার্কে তরুণ-তরুণীরা উল্লাস পালন করে এ দিবসে। মূলত কার্ড ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিক্রেতারাই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ দিবসের প্রচারণায় ইন্ধন জোগায়। ভালোবাসা দিবসে রাজধানী ঢাকায় একটি গোলাপ বিক্রি হয়েছে ২০ হাজার টাকায়! এ দিন যুবক-যুবতীরা যা করে তা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই নয়, তথাকথিত আবহমান কালের বাঙ্গালী সংস্কৃতির আলোকেও সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেন্টাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবসের যে ইতিহাস, তা জানলে কোনো মুসলিম সন্তান এ দিবস পালনে উৎসাহী হতে পারে না। তাই আসুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য জেনে নিই। এ দিবস সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আপনাদের খিদমতে নিম্নে পেশ করছি।

**ভ্যালেন্টাইন দিবসের ইতিহাস :**

**ঘটনা– ০১ :** 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের আগে চতুর্থ শতকে পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারীদের সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করতো। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য একজন দেবতার বিশ্বাস করতো। যে দেবতার নাম ছিল লুপারকালিয়া। এ দেবতার সন্তুষ্টির জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ছিল যুবতীদের নামে লটারি ইস্যু করা। যে যুবতীর নাম যে যুবকের ভাগে পড়ত সে তার সাথে আগামী বছরের এ দিন পর্যন্ত বসবাস করতো। এ দিন এলে দেবতার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হতো। জবাইকৃত পশুর চামড়া যুবতীর গায়ে পরিয়ে পশুটির রক্ত ও কুকুরের

* *দাওরায়ে হাদীস (মুমতায), বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (ফার্স্ট ক্লাস)। শিক্ষক- মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্, রানীবাজার, রাজশাহী এবং গবেষণা সহকারী- ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রানীবাজার, রাজশাহী।*

রক্তে রঞ্জিত চাবুক দিয়ে তাকে আঘাত করতো। তারা ভাবত এর দ্বারা নারী সন্তান জন্ম দেয়ার উপযুক্ত শাস্তি হয়। এ অনুষ্ঠানটি পালন করা হতো ১৪ ফেব্রুয়ারি।

খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাব হলে তারা এটাকে পৌত্তলিক কুসংস্কার বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু এতে দিবসটি পালন বন্ধ হয় না। পাদ্রীরা অপারগ হয়ে এ দিবসকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, আগে এ অনুষ্ঠান হতো দেবতার নামে, এখন থেকে হবে পাদ্রীর নামে। যুবকরা ১ বছর পাদ্রীর সোহবতে থেকে আত্মশুদ্ধি করবে। এ দিনে সেই সোহবত শুরু ও শেষ হবে। ৪৭৬ সনে পোপ জোলিয়াস এ দিবসের নাম পরিবর্তন করে এ দিবসের নাম যাজক ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' রাখে।

**ঘটনা– ০২ :** ভ্যালেনটাইন, রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস এর 'আমলের লোক। সে ছিল ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারক, সম্রাট ছিল রোমান দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাসী। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে। অপর বর্ণনায় : সম্রাট লক্ষ্য করেছে, অবিবাহিত যুবকরা বিবাহিত যুবকদের তুলনায় যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় বেশি দেয়। অনেক সময় বিবাহিতরা স্ত্রী-পুত্রের টানে যুদ্ধে যেতেও অস্বীকৃতি জানায়। তাই যুগল বন্দী তথা যে কোনো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। **সেন্ট ভ্যালেন্টাইন** এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গোপনে তার গির্জায় পরিণয় প্রথা চালু রাখে। এ খবর জানাজানি হলে সম্রাট তাকে জেল বন্দি করার নির্দেশ প্রদান করে। জেলের ভেতর-ই পরিচয় ঘটে জেলার-এর এক অন্ধ মেয়ের সাথে। সে ছিল চিকিৎসক। বন্দি অবস্থাতেই চিকিৎসা করে অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়-বলে ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এরপর সে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতো। এভাবে ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যায়। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে জানায়- 'ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন'। এর আগে মেয়েটি ৪৬ জন সদস্যসহ তার ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরপর থেকে তার মৃত্যুর তারিখ তথা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে নামে পালিত হতে শুরু করে।

**ঘটনা– ০৩ :** ভ্যালেন্টাইনকে 'আতারিত' যা রোমানদের বিশ্বাসে ব্যবসা, সাহিত্য, পরিকল্পনা ও দস্যুদের প্রভু এবং 'জুয়াইবেতার' যা রোমানদের সব চেয়ে বড়ো প্রভু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে উত্তরে বলে, এগুলো সব মানব রচিত প্রভু, প্রকৃত প্রভু হচ্ছে, 'ঈসা মসিহ।' ১৪ ফেব্রুয়ারি এ অপরাধে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে।

**ঘটনা– ০৪ :** রোমের সম্রাট ক্লডিয়াসের সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু, তরুণ প্রেমিকদেরকে গোপন পরিণয়-মন্ত্রে দীক্ষা দিত। এ অপরাধে সম্রাট ক্লডিয়াস ২৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করেন। তার এ ভ্যালেন্টাইন নাম থেকেই এ দিনটির নামকরণ করা হয় ভ্যালেন্টাইন ডে; যা আজকের বিশ্বে ভালোবাসা দিবস।

**ঘটনা– ০৫ :** ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এ দিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল।

**ঘটনা– ০৬ :** ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী মহিমময়ী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন।

**ঘটনা পর্যালোচনা :** এখানে সময়ের ব্যাপারে কিছুটা তারতম্য থাকলেও এটা বলা যেতে পারে যে, হতে পারে ২৬৯-৭০ এ দিবসটির জন্ম হলেও ৪৭৬ সালের দিকে এর বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হয়। আর এটা বাস্তব যে, এখন এটা পুরো যৌবনে উপনীত হয়েছে।

**বাংলাদেশে এর প্রচলন :** বাংলাদেশে এ দিবসটি পালন করা শুরু হয় ১৯৯৩ ইং সালে। কিছু ব্যবসায়ীর মদদে এটি প্রথম চালু হয়। অপরিণামদর্শী মিডিয়া কর্মীরা এর ব্যাপক কভারেজ দেয়। আর যায় কোথায়! লুফে নেয় বাংলার তরুণ-তরুণীরা। দিনটি যখন আসে তখন এ দেশের শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো একেবারে বেসামাল হয়ে উঠে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য উজাড় করে প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। শুধুই কি তাই! অঙ্কন পটীয়সীরা উল্কি আঁকার জন্য পসরা সাজিয়ে বসে থাকে রাস্তার ধারে ধারে। তাদের সামনে তরুণীরা পিঠ বাহু আর হস্তদ্বয় মেলে ধরে পছন্দের উল্কিটি এঁকে দেয়ার জন্য। শরীরে উল্কি আঁকাতে যেয়ে নিজের ইয্যত-আব্রু পরপুরুষকে দেখিয়ে আকৃষ্ট করে।

**ভালোবাসা দিবসে পশ্চিমা দেশ :** 'ভালোবাসা দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী যেন উন্মাদনায় মেতে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল-

রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড়ো শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী, প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। এ দিনে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে থাকে খাদ্য-দ্রব্য, ফুল, বই ছবি, "Be my valentine" (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোকলেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্যস্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হলো একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় ও অনুষ্ঠান করে।

১৮শত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এসব কার্ডে ভালো-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডেতে বিনিময় হত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

**ভালোবাসা দিবসে বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র :** ভালোবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড়ো বড়ো শহরগুলোসহ পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে। 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামি-দামি হোটেলের হলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালোবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ হলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নীল করা হয় হলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাঁটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালোবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান। ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকাল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালোবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা, কিশোর-কিশোরী যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রেম সংগীত, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা। এক শ্রেণির তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালোবাসা বিলাতে ও কথিত রোমান্স নামক অশ্লীলতার প্রদর্শন করতে। অশ্লীলতা, নোংরামি ও বেহায়াপনা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে ২০১৭ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারীতে রাজশাহী ভার্সিটির কিছু নিচুঁ মন মানসিকতার শিক্ষার্থীরা 'প্রেম বঞ্চিত সংঘের' ব্যানারে মিছিল করে যার স্লোগান ছিল 'কেউ পাবে-কেউ পাবে না, তা হবে না তা হবে না', প্রেমের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[৫১]

**এ দিবসের সর্বনিকৃষ্ট কাজ :** এ দিবসের দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়। মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশি সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। নেশায় বুদ হওয়াও নতুন কোনো সংবাদ নয়। তারা এত কাছাকাছি আসে যে একে অপরের মধ্যে হারিয়ে যায়। শয়তান তাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়।

**আমাদের করণীয় :** ১৪ ফেব্রুয়ারির এ জাতীয় সকল পাপাচারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। একজন আদর্শ মুসলিম অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, যিনা-ব্যভিচার, অশ্লিলতা-বেহায়াপনাসহ এ সকল নোংরা কাজ করতে পারে না, এমনকি এর নিকটবর্তীও হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

**অর্থ :** "আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[৫২] ❑

---

[৫১] *দৈনিক সোনালী সংবাদ- ১৫ ফেব্রুয়ারি-২০১৭।*
[৫২] *সূরা বানী ইসরাঈল : ৩২।*

# ইসলাম নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে

–শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী*

**১.** ইসলাম আগমনের পূর্বে জাহেলী যুগের লোকেরা মহিলাদের অপছন্দ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত।"[৫৩]

তারা তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ○ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৫৪]

অতঃপর ইসলাম এগুলো হারাম ঘোষণা করে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাস্তবায়ন করার দিকে আহ্বান জানিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ে সন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিনে সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকব, এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দিলেন।"[৫৫]

রাসূল ﷺ বলেন, "যাকে এ সব কন্যা সন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।"[৫৬]

**২.** জাহেলী যুগের লোকেরা মহিলাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ওয়ারিশ বানাতো না অতঃপর ইসলাম তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করল; আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"[৫৭]

**৩.** ইসলাম আগমনের সময় জাহিলি যুগের লোকেরা জবরদস্তি করে মহিলাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে ভোগ করতো। কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে তার স্বামীর কোনো ওয়ারিশ তার নিকট এসে তার উপর একটি কাপড় নিক্ষেপ করে বলতো, "আমি এর উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক অনুরূপভাবে তার সম্পদেরও উত্তরাধিকার সূত্রের মালিক।" অতঃপর এই ব্যক্তিটি সেই মহিলার ব্যাপারে যাবতীয় অধিকার ভোগ করতো। এরপর ইসলাম এসে এই ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"[৫৮]

**৪.** ইসলাম আগমনের পূর্বে জাহেলী যুগে আরবরা মহিলাদেরকে বিভিন্নভাবে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখত এবং বিভিন্নভাবে তাদের অধিকার খর্ব করতো। যেমন-

* স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে বাধা দিত যতক্ষণ না তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার খরচকৃত সমস্ত সম্পদ ফেরত দেয়।
* পিতা তার কন্যাকে এবং ভাই তার বোনকে ইচ্ছা করলেই বিয়েতে বাধা দিতে পারতো।
* স্বামী স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করতো এবং স্ত্রী কিছু সম্পদ "মুক্তিপন" হিসেবে স্বামীকে পরিশোধ না করলে স্বামী তালাক দিত না।

---

* *বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*
[৫৩] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৫৮।*
[৫৪] *সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯।*
[৫৫] *সহীহ মুসলিম।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৫৭] *সূরা আন্ নিসা : ৭।*
[৫৮] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*

অতঃপর ইসলাম এ ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং সেগুলোকে সমূলে উৎপাটন করলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾

"তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"[৬০]

**৫.** ইসলাম পূর্বযুগে মহিলারা দুই ক্ষেত্রে খুব কষ্ট ভোগ করত। প্রথমত স্বামীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার এবং দ্বিতীয়ত তাদের মন্দ আচরণ। অতঃপর ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করে স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করা আবশ্যক সেগুলো পালনের আদেশ প্রদান করল; আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।"[৬১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।"[৬২]

**৬.** ইসলাম আগমনের পূর্বে বিধবা মহিলাদের পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করতে হতো। কিন্তু ইসলাম সেটিকে হালকা করে এক বছরের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছে; আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা নিজেরা (স্ত্রীরা) চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে।"[৬৩]

**৭.** ইসলাম মহিলাদের জন্য কল্যাণ কামনা করার আদেশ প্রদান করেছে; রাসূল ﷺ বলেন : "আর তোমার নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে"[৬৪] এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে নিষেধ করেছে, রাসূল ﷺ বলেন : "কোনো ঈমানদার পুরুষ যেন কোনো ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।"[৬৫]

রাসূল ﷺ বলেন, "যেসব লোক নিজেরদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অধিক উত্তম।"[৬৬]

রাসূল ﷺ আরো বলেন : "দুনিয়া উপভোগের উপকরণ, আর দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।"[৬৭] ❑

## আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

*[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

---

[৫৯] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*
[৬০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩২।*
[৬১] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*
[৬২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২৮।*
[৬৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৪।*
[৬৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৬৫] *সহীহ মুসলিম।*
[৬৬] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

# সর্বপ্রাচীন গৃহ কাবার ইতিকথা

**–মুহাম্মদ আব্দুস শাকুর**

আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর (কা'বা) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন : "নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট (প্রতিষ্ঠা) করা হয়েছে, তা ঐ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত; ওটা বরকতময় এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যে পথ-প্রদর্শক।"[৬৮] এ আয়াতে কারীমায় কা'বার তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে– **প্রথমত** এটি সারা বিশ্বের সর্বপ্রথম উপাসনালয়। **দ্বিতীয়ত** এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। **তৃতীয়ত** এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

উল্লেখিত আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হয়, তা ঐ গৃহ যা বাক্কায় অবস্থিত। অতএব, কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম 'ইবাদতগৃহ বা উপাসনালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ 'ইবাদতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোনো উপাসনালয় ছিল না এবং বাসগৃহও ছিল না।

আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন আল্লাহর নাবী। তার পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহর ঘর অর্থাৎ- 'ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম উপাসনালয়। পক্ষান্তরে এটা সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহই পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু 'ইবাদতের জন্য কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে তাদেরকে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদের তা তাওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ যা মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (ইবনু কাসীর) কোনো কোনো হাদীসে আছে, আদম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

অতঃপর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ায় একবার আমালেকা সম্প্রদায়, একবার কুরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে।

সর্বশেষ এর নির্মাণে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনি "হাজরে আসওয়াদ" স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের নির্মাণের ফলে ইব্রাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রথমত কা'বার একটি অংশ "হাতীম" কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাদমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্ব দিকে একটি দরজা রাখে।

**তৃতীয়ত** তারা সমতলভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে যাতে সহজে সবাই ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন : আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও মুসলিম লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। দুঃখজনক হলেও সত্য রাসূলের এ কথাবার্তার কিছু পরেই মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ভাগ্নে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করেছেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশি দিন টিকেনি।

অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ মক্কায় সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে শহীদ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটিও মুছে ফেলতে মনস্থ করে। সে মতে সে জনতার মধ্যে প্রচার করেতে থাকে যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের-এর এ কাজ ঠিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহিলিয়াত আমলে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। *[১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[৬৮]. *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৬।*

বিস্ময়-বৈচিত্র

# দেহকোষ : মানবদেহের মৌচাক

–মো. হারুনুর রশিদ*

**দেহ কোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** মানুষ হলো ট্রিলিয়ন কোষ দ্বারা গঠিত জটিল জীব, যার প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব কাঠামো এবং ফাংশন দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা গড় মানবদেহে কোষের সংখ্যা নির্ধারণে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছেন। সাম্প্রতিক অনুমানগুলো প্রমাণ করে কোষের সংখ্যা প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন (৩০,০০০,০০০,০০০,০০০!) করে।

এই কোষগুলো মানুষের সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বুনিয়াদি কার্য সম্পাদন করে সমন্বিতভাবে কাজ করে। তবে এটি কেবল আপনার দেহের অভ্যন্তরে মানুষের কোষ নয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে মানবদেহে ব্যাকটেরিয়া কোষের সংখ্যা সম্ভবত মানুষের কোষের সংখ্যাকে অতিক্রম করে।

**মানবকোষের সৃষ্টি :** প্রত্যেকটা জীবকোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রোটিনের অণু। এই প্রোটিনের অণুর মধ্যে পাঁচটি উপাদান থাকে, যথা- কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর সালফার। এছাড়া একটা অণু তৈরি করতে গেলে হাজার হাজার পরমাণু প্রয়োজন হয়। হাজার হাজার পরমাণু নিয়ে একটা প্রোটিন অণু হয়। আর পৃথিবীতে আনুমানিক ৯২টি স্বাধীন উপাদান আছে। এই ৯২টি উপাদানের মধ্যে ৫টি মিলে একটি অণু গঠন করবে আর এটার মধ্যে হাজার হাজার পরমাণু আছে। এগুলো মিলেই তৈরি হবে একটি প্রোটিনের অণু।

এটার সম্ভাবনা হিসাব করেছেন ফ্রান্স এলিয়েন। তার মতে সম্ভাবনা হলো এক বাই দশ টু দি পাওয়ার একশ ষাট। এই এক বাই দশ টু দি পাওয়ার দুই। দশ টু দি পাওয়ার দুই মানে এক শূন্য। দুইটা শূন্য এক বাই একশ। এখানে সম্ভাবনা এক পার্সেন্ট। যদি বলা হয় এক বাই দশ টু দি পাওয়ার তিন। তার মানে এক বাই এক হাজার। সেটা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট। যদি বলা হয় এক বাই দশ টু দি পাওয়ার চার তার মানে এক বাই দশ হাজার। অর্থাৎ- পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট। তাহলে যখন হিসাব করা হবে এক বাই দশ দি পাওয়ার একশ ষাট তার মানে পয়েন্ট জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো জিরো প্রথমে একশ সাতান্ন শূন্য তারপর এক। অংকের থিয়োরি বলে যদি কোনো সংখ্যা এক বাই দশ টু দি পাওয়ার পঞ্চাশ হয় তখন শূন্যই বলা হয়। এর পরে এখানে বলা হয়েছে মাত্র একটা অণু নিয়ে। আর যে উপাদানগুলো দরকার একটা প্রোটিনের অণু তৈরি করতে, সেটার হিসাব করেছেন আরেকজন চার্লস গাই, তিনি বলেছেন– সেক্ষেত্রে লক্ষ কোটি উপাদানের প্রয়োজন হবে।

আমাদের গ্যালাক্সির মতো বড় লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির প্রয়োজন হবে শুধু একটা প্রোটিনের অণু তৈরি করতে সময় লাগবে দশ টু দি পাওয়ার দুইশ তেষট্টি বছর। যখন কোনো শিশু জন্মায় তখন তার শরীরে ছয়শ কোটিরও বেশি কোষ থাকে। এখানে একটা প্রোটিনের অণু তৈরির সম্ভাবনা এক বাই দশ টু দি পাওয়ার একশ ষাট। আর এখানে সময় লাগবে দশ টু দি পাওয়ার দুইশ তেষট্টি বছর। তাহলে ছয়শ কোটি কোষ তৈরি সম্ভাবনা কত? হঠাৎ করে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য শূন্য শূন্য কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই স্পষ্টত বলা যায়, এই সৃষ্টি হঠাৎ করে হতে পারে না। অবশ্যই এর পেছনে রয়েছে। কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তি।

**মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের কোষ কত :** দেহে প্রায় ২০০ বিভিন্ন ধরনের কোষ রয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ : লাল রক্ত কোষ (এরিথ্রোসাইটস), ত্বকের কোষ, নিউরন (স্নায়ু কোষ), চর্বি কোষ।

মানুষগুলো বহুকোষী, জটিল জীব। আমাদের দেহের অভ্যন্তরের কোষগুলো "বিশেষায়িত"। এর অর্থ হলো প্রতিটি ধরনের ঘর একটি অনন্য এবং বিশেষ ফাংশন সম্পাদন করে। এই কারণে, দেহে ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কোষের প্রতিটিরেই আলাদা কাঠামো, আকার, আকার এবং ফাংশন থাকে এবং এতে বিভিন্ন অর্গানেল থাকে। **উদাহরণস্বরূপ :**

* *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর;* ***মেম্বার :*** *Qur'an Research Foundation।*

১. মস্তিষ্কের কোষগুলো আকারে দীর্ঘ হতে পারে তাই তারা আরও দক্ষতার সাথে সংকেত প্রেরণ করতে পারে।

২. হার্টের কোষগুলোতে মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি থাকে কারণ তাদের প্রচুর শক্তি (Energy) প্রয়োজন।

৩. শ্বসনতন্ত্রের কোষগুলো অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করার জন্য দায়ী।

৪. মানব দেহকে দক্ষতার সাথে চলমান রাখতে সমস্ত কোষ একত্রে কাজ করে।

**মানবদেহে কয়টি কোষ রয়েছে–** সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে একজন মানুষের প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন মানব কোষ থাকে বলে অনুমান করা হয়।

এটি অবশ্যই নিশ্চিত নয়। মানুষের কোষ গণনা একটি অসাধারণ জটিল। এটি কোনও একক কোষের আকার বা ওজন নির্ধারণ এবং মানবদেহের আয়তনের উপর ভিত্তি করে অনুমান তৈরি করার মতো সহজ নয়।

মানবদেহে ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কোষের প্রত্যেকটির আলাদা ওজন ও আকার থাকে। শরীরের মধ্যে, কিছু কোষ আরও ঘন হয়ে থাকে, আবার অন্যগুলো আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

ঘরগুলো ক্রমাগত মারা যাচ্ছে এবং একই সাথে নতুন তৈরি করা হচ্ছে। তার উপরে, কোষগুলোর প্রকৃত সংখ্যা তাদের বয়স, উচ্চতা, ওজন, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত কারণগুলোর উপর নির্ভর করে ব্যক্তি থেকে পৃথক হয়ে যায়।

একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে একটি অনুমান পাওয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের এক ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ওজন ৭০ কিলোগুলো (১৫৪ পাউন্ড) এবং উচ্চতা দৈর্ঘ্য ১৭০ সেন্টিমিটার (৫ ফুট, ৭ ইঞ্চি) পরিমাপ করা হয়েছিল।

গবেষণায়, গবেষকরা প্রতিটি কোষের ধরনের মাধ্যমে গিয়েছিলেন এবং প্রতিটি ধরনের সংখ্যা অনুমান করতে বিভিন্ন ক্লান্তিকর পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ভলিউম এবং ঘনত্বের বিশদ তালিকা তৈরি করতে উপলব্ধ সর্বাধিক আপ টু ডেট তথ্য ব্যবহার করেন। এতে তারা লক্ষ্য করেন কোষের সংখ্যা প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন।

**মানবদেহে কয়টি ব্যাকটিরিয়া কোষ রয়েছে–** আপনি পড়ে থাকতে পারেন যে মানব দেহের ব্যাকটিরিয়া কোষগুলো ১০ থেকে ১ এর চেয়ে বেশি হয় যা অনুপাতের প্রাথমিক উৎসটি ১৯ ১৯৭০০-এর দশকের, যখন আমেরিকান মাইক্রোবায়োলজিস্টরা অন্ত্রের ট্র্যাক্টের ভিতরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা গণনা করার জন্য একাধিক অনুমানের একটি সিরিজ ব্যবহার করেছিলেন।

১০ : ১ অনুপাতটি তখন থেকে অস্বীকৃত। নতুন তথ্য দেখায় যে, একটি মানব দেহের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া কোষের সংখ্যা প্রায় ৩৮ ট্রিলিয়ন। এটি শরীরের অনুমান ৩০ ট্রিলিয়ন মানব কোষের অনেক কাছাকাছি হয়ে গেছে।

সুতরাং, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আপনার শরীরে মানুষের কোষের চেয়ে বেশি ব্যাকটিরিয়া কোষ থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, পার্থক্যটি আগের ভাবার মতো দুর্দান্ত নয়।

**মানবদেহে কয়টি রক্ত কোষ রয়েছে–** রক্তের কোষগুলো তিন ধরনের রয়েছে– লোহিত রক্তকণিকা, সাদা রক্তকণিকা এবং প্লেটলেটগুলো। লোহিত রক্তকণিকা (আরবিসি) এখন পর্যন্ত মানব দেহে সর্বাধিক প্রচুর পরিমাণে কোষ, যা সমস্ত কোষের ৮০ শতাংশের বেশি।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কোথাও গড়ে প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন আরবিসি থাকে। মহিলাদের মধ্যে সাধারণত পুরুষের চেয়ে কম আরবিসি থাকে, তবে উচ্চতর অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের সাধারণত বেশি থাকে।

সাম্প্রতিক গণনার উপর ভিত্তি করে দেহে প্রায় ১৪৭ মিলিয়ন প্লেটলেট এবং আরও ৪৫ মিলিয়ন লিম্ফোসাইটস (এক ধরনের সাদা রক্তকণিকা) রয়েছে।

**মানুষের মস্তিষ্কে কয়টি কোষ রয়েছে–** প্রায় নতুন গবেষণা অনুসারে গড়ে পুরুষ মস্তিষ্কে প্রায় ১৭১ বিলিয়ন কোষ রয়েছে ৮৬ বিলিয়ন নিউরন। নিউরন হলো এমন কোষ যা মস্তিষ্ক জুড়ে সংকেত প্রেরণে সহায়তা করে। মস্তিষ্কে ৮৫ বিলিয়ন অন্যান্য কোষও রয়েছে, যাকে বলা হয় গ্লিয়াল সেল, যা নিউরনকে সহায়তা করতে সহায়তা করে।

**মানবদেহ প্রতিদিন কতটি কোষ উৎপাদন করে–** কোনও দিন আপনার দেহ ঠিক কতগুলো ঘর তৈরি করে তা পরিমাপ করা কঠিন। প্রতিটি ২০০ ধরনের কোষের জীবনকাল যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, সুতরাং প্রতিটি ধরনের কোষ সমান হারে উৎপাদিত হয় না।

একটি ভালো শুরু হলো প্রতিটি দিন যে পরিমাণ আরবিসি তৈরি হয় সেগুলো লক্ষ্য করা, কারণ আরবিসিগুলো দেহের সর্বাধিক প্রচুর পরিমাণে কোষ cell আরবিসি প্রায় ১২০ দিন বেঁচে থাকে, ততক্ষণে সেগুলো প্লীহা এবং যকৃতের ম্যাক্রোফেজ দ্বারা সঞ্চালন থেকে সরানো হয়। একই সময়ে, বিশেষ স্টেম সেলগুলো প্রায় একই হারে মৃত লাল রক্তকণিকা প্রতিস্থাপন করে।

গড় শরীর প্রায় তৈরি করে ২ থেকে ৩ মিলিয়ন প্রতি সেকেন্ডে রক্তের রক্তকণিকা বা প্রতিদিন প্রায় ১৭৩ থেকে ২৫৯ বিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করে।

**মানুষের দেহে প্রতিদিন কতটি কোষ মারা যায় :** বেশিরভাগ, তবে সমস্ত নয়, দেহের কোষগুলো শেষ পর্যন্ত মারা যাবে এবং প্রতিস্থাপন করা দরকার। ভাগ্যক্রমে, একটি স্বাস্থ্যকর মানবদেহ উৎপাদিত কোষের সংখ্যা এবং মারা যাওয়া কোষের সংখ্যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম।

**উদাহরণস্বরূপ :** শরীরটি প্রতিদিন ১৭৩ থেকে ২৫৯ বিলিয়ন আরবিসি তৈরি করছে, প্রায় একই সংখ্যক আরবিসি মারা যাচ্ছে।

মানুষের দেহে প্রতিদিন কতটি কোষ মারা যায় তা নির্ধারণ করা চ্যালেঞ্জিং। কক্ষগুলো তাদের জীবনচক্রের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে তৈরি হয় না। উদাহরণস্বরূপ সাদা রক্তকণিকা কেবলমাত্র ১৩ দিনের জন্য বেঁচে থাকে, যেখানে লাল রক্তকণিকা প্রায় ১২০ দিন বেঁচে থাকে। অন্যদিকে লিভারের কোষগুলো ১৮ মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মস্তিষ্কের কোষগুলো কোনও ব্যক্তির সারা জীবন জীবিত থাকবে।

**মানুষের শরীরের সবথেকে বড়ো এবং সবথেকে ছোট কোষের নাম কী :** মানুষের শরীরের সবথেকে বড়ো (largest) কোষের নাম হলো ডিম্বকোষ (Ovum Cell)। এটি মোটামুটি এক মিলিমিটার সাইজের হয়, তাই খালি চোখে এটি দেখা সম্ভব।

অনেকেই সবথেকে লম্বা (longest) এবং সবথেকে বড়ো (largest) কোষের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় মানুষের শরীরের সব থেকে লম্বা কোষ তাহলে তার উত্তর হবে স্নায়ু কোষ (Neurone)। আর মানুষের শরীরের সব থেকে ছোট (Smallest) কোষের নাম হলো male gametes অর্থাৎ- শুক্রাণু। এর মাথার (Head) দৈর্ঘ্য মাত্র চার মাইক্রোমিটার এবং যদি তুলনা করা হয় তাহলে এটি লোহিত রক্তকণিকার থেকে সামান্য ছোট। তাই এটি খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এটি দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন।

**বিজ্ঞানীদের অভিমত :** আগের চেয়ে আরও পরিশীলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে, নতুন গবেষণায় অনুমান করা হয় যে গড়ে প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন মানুষের কোষ রয়েছে। লাল রক্ত কোষগুলো এই কোষগুলোর বেশিরভাগ অংশ নিয়ে গঠিত।

অবশ্যই এগুলো আমাদের দেহের একমাত্র কোষ নয়। নতুন গবেষণা আরও দেখা গেছে যে, মানুষের মধ্যে গড়ে প্রায় ৩৮ ট্রিলিয়ন ব্যাকটিরিয়া রয়েছে। এটি ৬৮ ট্রিলিয়ন কোষের (গ্রাহ্য বা না) মোটামুটি।

এটি কোনওভাবেই মানবদেহে কোষের সংখ্যার চূড়ান্ত অনুমান নয়, তবে এটি একটি ভালো শুরু। সময়ের সাথে সাথে, বিজ্ঞানীরা এই গণনাগুলোকে সূক্ষ্মভাবে চালিয়ে যাবেন।

**দেহকোষে (Cell) রাযোর প্রভাব :** রাযোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো কোষ ও কোষের অভ্যন্তরে প্রবহমান পদার্থের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা। যেহেতু রাযো রাখার প্রবহমান পদার্থ সমূহের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে, তাই এর ফলে কোষের কার্যক্রমে প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে লালাযুক্ত ঝিল্লির উপরের অংশে সংযুক্ত কোষগুলোও যাকে (Wpithelial) এপিথেলিয়াল সেল বলা হয়, যা দেহের আদ্রর্তাকে অনবরত নিষ্কাশনের দায়িত্বে নিয়োজিত। সিয়ামের দ্বারা অর্জন করে অনাবিল শান্তি। যার ফলে এদের সুস্থতায় যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। কোষ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, লালা প্রস্তুতকারী মাংসগ্রন্থি ঘাড়ের মাংসগ্রন্থি, আঠাল গ্রন্থি (Pencreas) সবই অধীর আগ্রহ নিয়ে রমযান মাসের জন্য অপেক্ষমান থাকে। যেন রমযানের আগমনে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সুযোগ পায়। আর অতিরিক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য এনার্জী তৈরীতে সক্ষম হয়। ❑

## জমঈয়ত সংবাদ

### পাথরঘাটা (বলফিল্ড) আহলে হাদীস জামে মসজিদে শাখা গঠন

গত ২২ জানুয়ারি রবিবার সাতক্ষীরা জেলাধীন ঝাউডাঙ্গা এলাকার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম পাথরঘাটা বলফিল্ড আহলে হাদীস জামে মসজিদ শাখা গঠন করা হয়। বাদ আসর অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আবুল কাসেম সরদার। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মো. মফিজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলা শুব্বান সভাপতি প্রভাষক আসাদুল্লাহ আল গালীব, কলারোয়া উপজেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের। নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পাথরঘাটা বলফিল্ড আহলে হাদীস জামে মসজিদ শাখা গঠন করা হয়।

**দায়িত্বশীলদের নাম :** সভাপতি- মো. আবুল কাসেম সরদার, সহ-সভাপতিদ্বয়- মো. মনিরুজ্জামান ও আলহাজ আকবর আলী, সেক্রেটারি- মো. জাহিদ ইকবাল, সহকারী সেক্রেটারি- মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাওলানা নজরুল ইসলাম, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- মো. আহসান উল্লাহ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুস ছালাম (বাবলু), শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- মো. আবুল কালাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- আলী মানছুর, পাঠাগার সম্পাদক- মো. মানছুর আহমাদ, দপ্তর সম্পাদক- মো. মফিজুল ইসলাম। **সদস্যবৃন্দ–** মো. আবুল হাসান, মো. আবুল হোসেন, মো. মাহীরুল ইসলাম, মো. জহিরুল ইসলাম, মো. মশিউর রহমান, মো. আনারুল ইসলাম।

### ঝিনাইদহে কেসমত-ঘোড়াগাছা শাখা জমঈয়ত কমিটি গঠন

গত ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ হরিণাকুন্ড উপজেলাধীন কেসমত ঘোড়াগাছা আহ্‌লে হাদীস জামে মসজিদে সফর করেন। এ সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওনানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল খান, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, কার্যকরী কমিটির সদস্য মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ও মুহাম্মদ বজলুর রহমান প্রমুখ। সকল প্রকার মতবিরোধ ও মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্লাটফর্মে সবাইকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তে সভাপতি আব্দুল জলিল খাঁন। বাদ জুমু'আহ্ কেসমত-ঘোড়াগাছা আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহা. আব্দুল মান্নানের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ও ঝিনাইদহ জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হকের উপস্থাপনায় এক সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ। অতঃপর মুহাম্মদ শহিদুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মদ আব্দুর রশিদকে সেক্রেটারি করে কেসমত-ঘোড়াগাছার ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শাখা জমঈয়তের কমিটি গঠন করা হয়। পরিশেষে জেলা জমঈয়তের সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## মৃত্যু সংবাদ

**(১)** পাবনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন মধু'র মমতাময়ী 'মা' গত ২৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

**(২)** বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আসগর আলী গত ২৯ জানুয়ারি রবিবার আনুমানিক রাত ১১টায় মৃত্যুবরণ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

## শুব্বান সংবাদ

# কেন্দ্রীয় শুব্বানের সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দক্ষ ও যোগ্য কর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর তৃতীয় স্তরের কর্মীদের (সালেক) নিয়ে দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ীর জমঈয়ত ভবনের 'আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে এ কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো. আকবর আলীর যৌথ সঞ্চালনায় শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের ক্বিরাত পরিচালক হাফেয আহসান হাবীবের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সূরা আল-হাদীদের ১০-১১ আয়াতের দারসুল কুরআন পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী। প্রথম দিন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানসূচি মোতাবেক পর্যায়ক্রমে আলোচনা উপস্থাপন করেন মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজিরা বাজার, ঢাকার অধ্যক্ষ ড. জাকারিয়া বিন আব্দুল জলিল মাদানী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ গোলাম রহমান, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি ও সউদী দূতাবাসের কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার সূচি অনুযায়ী সকাল সাড়ে ০৮টায় প্রোগ্রাম শুরু হয়। খুলনার আল মাহাদ আস্ সালাফী শুব্বান শাখার প্রচার সম্পাদক আবু হোরায়রা বিন হাসমত আলী সূচনাপর্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ নূরুল আবসার দারসুল হাদীস পেশ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া নূরী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন ও তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর।

দুই দিনের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং অংশগ্রহণকারী অগ্রসর কর্মীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, হাফেয আশিক বিন আশরাফ, মুহাম্মদ আকবর আলী, মুহাম্মদ তাকী উদ্দীনসহ মাজলিসে আম সদস্যবৃন্দ।

মেধা, শ্রম, আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা ও নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বিবেচনায় অগ্রসর কর্মীদের মধ্যে মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম রানা (বগুড়া), মুহাম্মদ তাওহীদ বিন হেলাল (কুমিল্লা), মুহাম্মদ তাকিবুল ইসলাম (রংপুর), হাফেয আমিনুল ইসলাম (রংপুর), মুহা. মোস্তাফিজুর রহমান (মেহেরপুর), মুহা. আব্দুস সবুর (কুমিল্লা), মুহা. মিজানুর রহমান (ঠাকুরগাঁও), মো. আব্দুল্লাহ মানসুর (টাঙ্গাইল), মো. মেসবাহুল হক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), হাফেয আমানুল্লাহ (নরসিংদী), মুহা. আব্দুর রহমান মাদানী (নারায়ণগঞ্জ) কেন্দ্রীয় সভাপতির হাতে সংগঠনের সর্বোচ্চ মানের কর্মী তথা সালেহ হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

শুব্বানের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে কেন্দ্রীয় সালেক কর্মীদের নিয়ে কিয়ামুল লাইলের অনুশীলন এ কর্মশালার অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল, যা কর্মীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইন্‌শা-আল্লাহ। এ সেশনের নেতৃত্ব দেন শুব্বানের বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক ইমাম হাসান মাদানী। শুব্বানের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলামের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। এ কর্মশালায় সারাদেশ থেকে ২২০ জন সালেক ও অগ্রসর আরেফ মানের কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

## বগুড়া জেলা শুব্বান এর দ্বি বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ০২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বগুড়ার নবাববাড়ী রোডে টিএমএসএস হলে বগুড়া জেলা শুব্বানের দ্বি বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শুব্বান সভাপতি নাযীর আহমাদ সরকারের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক নূরুল ইসলামের সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বগুড়া জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ আবু নছর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের ছাত্র/সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফিয আশিক বিন আশরাফ, বগুড়া জেলা শুব্বানের পরিচালক মাওলানা মো. ইবরাহীম বিন আবু সুফিয়ান, বগুড়া জেলা জমঈয়তের দফতর সম্পাদক অধ্যক্ষ কামাল পাশা, শুব্বানের বগুড়া জোন প্রধান আনিসুর রহমান মাদানী, আল মারকাযুল ইসলামী নশিপুরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাইখ আব্দুর রউফ, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস আস সালাফিয়ার অধ্যক্ষ শাইখ ওমর ফারুক, উপাধ্যক্ষ শাইখ ইসমাইল হোসেন, মজলিসে আম সদস্য হাফিয জায়দুল আলম নাদিম, সোনাতলা উপজেলা শুব্বানের সভাপতি ইউসুফ নিজামী প্রমুখ।

আলোচনা পর্ব শেষে নাযীর আহমাদ সরকারকে সভাপতি ও নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৬ সদস্যের বগুড়া জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

**বগুড়া জেলা শুব্বানের কার্যনির্বাহী কমিটির বিবরণ–** সভাপতি- নাযীর আহমাদ সরকার, সহ-সভাপতি- মো. রবিউল ইসলাম রানা ও ইঞ্জিনিয়ার নাজির আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক- মো. নূরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- এ বি এম ফরিদুজ্জামান রুবেল, কোষাধ্যক্ষ- হাফিয আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক- মো. সামিউল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক- মো. খোরশেদ আলম, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক- মো. রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক- এইচ এম আবু হোরায়রা, ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মো. কামারুজ্জান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক- মো. আরিফুল ইসলাম, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক- হাফিয মো. জাহিদুর রহমান, দফতর সম্পাদক- মো. আব্দুল মাজেদ, পাঠাগার সম্পাদক- আব্দুল্লাহ আবুল কাসেম, যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক- মো. সাব্বির হোসাইন।

**উপদেষ্টামণ্ডলী–** মাওলানা মো. আব্দুল হক, অধ্যক্ষ আবু নছর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, মাওলানা মো. ইবরাহীম বিন আবু সুফিয়ান, আনিসুর রহমান মাদানী, জিন্নাহুর রহমান রাকিব।


## ড্রাইভার আবশ্যক

জরুরিভিত্তিতে **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**-এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য একজন অভিজ্ঞ **ড্রাইভার নিয়োগ** করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য বা সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে।

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবড়ী, ঢাকা-১২০৪।

☎ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪; ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১

# বায়ুদূষণ : হুমকিতে শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য

ঢাকার বাতাসে বেড়ে গেছে সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড। তার সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস। এমনকি এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্লাস্টিক কণাও। শুধু তাই নয়, ঢাকার বায়ুতে ক্ষতিকর বস্তুকণার মধ্যে সীসাও রয়েছে। ফলে বাড়ছে বায়ু দূষণ। যা মারাত্মক ক্ষতি করছে মানবদেহের। ভয়েস অফ আমেরিকার এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "এ সমস্ত ক্ষতিকর উপাদান ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করছে। মানুষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই বিষাক্ত উপাদানগুলো গ্রহণ করছে এবং শ্বাসতন্ত্রের নানা অসুখে ভুগছে। এমনকি হৃদরোগও বেড়েছে।"

টানা দশ দিন ধরে বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। সোমবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) স্কোর ২৯১ রেকর্ড করা হয়েছে। যার অর্থ হলো জনবহুল এ শহরের বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোর 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়, যেখানে ৩০১ থেকে ৪০০ এর স্কোর 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

মেগাসিটি ঢাকা দীর্ঘদিন ধরেই এ বায়ুদূষণে ভুগছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ুদূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো– ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলা। বর্তমানে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণকাজ, রাস্তার ধুলা ও অন্যান্য উৎস থেকে দূষিত কণার ব্যাপক নিঃসরণের কারণে ঢাকা শহরের বাতাসের গুণমান দ্রুত খারাপ হতে শুরু করে।

মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, "বায়ুদূষণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে শিশুরা, বিশেষ করে যাদের বয়স ১৪ বছরের মধ্যে। শিশুদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে ঢাকার বাতাসের মধ্যে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলো। কারণ দূষণের ধাক্কা সামলানোর জন্য শিশুদের ফুসফুস পরিপক্ব থাকে না। আমাদের ফুসফুসের মধ্যে একটা তরল পদার্থ রয়েছে যাকে সারফেকট্যান্ট বলে। এটি ফুসফুসের দু'টি অংশকে একসাথে আটকে যেতে বা সংকুচিত হয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। সারফেকট্যান্ট না থাকলে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হবে।"

তিনি বলেন, "ঢাকার দূষিত বায়ু ফুসফুসের এই তরল পদার্থটি নষ্ট করে ফেলছে। বিশেষ করে, যানবাহনের পেট্রোল থেকে উৎপাদিত মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়া, ঢাকায় এই বিষাক্ত উপাদানগুলো ছড়াচ্ছে। এভাবে শিশু ও বয়স্ক মানুষের ফুসফুস কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বড়ো ধরনের দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যা যেমন সিওপিডি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ফুসফুসের প্রদাহজনিত সমস্যা বাড়তে পারে এমনকি ক্যানসারও হতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "একটি শিশু যদি শৈশবেই এ ধরনের শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তাহলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ সমস্যাগুলো জটিল আকার ধারণ করে। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং তা অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও তৈরি করে। সীসা শিশুদের হার্ট, কিডনি ও লিভারকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। শরীরের অপরিহার্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আক্রান্ত হলে শিশুর আয়ুষ্কাল কমে যাবে। বায়ুদুষণের প্রভাব পড়ে খাদ্য, পরিবেশ, পানি সবকিছুর উপর। যার ফলে ঢাকায় জন্ম নেয়া নবজাতক শিশুর মধ্যে এখন হৃদরোগ, ডায়েবেটিসের মতো অসুখও পরিলক্ষিত হচ্ছে।"

ডা. মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, "সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। বায়ুতে উপস্থিত বিষাক্ত উপাদানের ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর। এতে পুরুষের শুক্রাণু তৈরির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, আবার ডিম্বানুর সাথে নিষিক্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন সুস্থ শুক্রাণুও তৈরি হচ্ছে না। অপরদিকে নারীদের

ক্ষেত্রেও তাই। ডিম্বাণু তৈরির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আবার দুর্বল বা নষ্ট ডিম্বাণু তৈরি হচ্ছে, ফলে এসব ডিম্বাণু যখন শুক্রাণুর সাথে নিষিক্ত হয়ে ভ্রূণ তৈরি করে সেই ভ্রূণ জরায়ুর নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান তৈরি করতে পারে না। ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "আবার দেখা যাচ্ছে, কিছু প্রেগন্যান্সিতে গর্ভাবস্থায় শিশু বাড়ছে না। সেটারও মূল কারণ বায়ুদূষণ। এ ধরনের শিশু হয় গর্ভেই মারা যায় অথবা অতিরিক্ত অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ ধরনের দুর্বল শিশু জন্মের পরও বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। এজন্য বাংলাদেশে নবজাতক মৃত্যুর হারও দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। যদিও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কাজ হচ্ছে, দায়বদ্ধতা আমাদের সবার।"

যানবাহনের দূষণ এবং ঢাকার আশে পাশের এলাকাগুলো থেকে ইটভাটা সরানো গেলে বায়ুদূষণ কমানো সম্ভব হবে বলে মত দেন ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম। *[সূত্র : (ভয়েস অফ আমেরিকা) একুশে টেলিভিশন অনলাইন।]*

## হার্নিয়ার রকমফের এবং কেন হয়

পেটের হার্নিয়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোগ। এই রোগটি নিয়ে অবহেলা নয়। যদি দেখা যায় হঠাৎ করে কারও নাভী, উদর ও উরুর সংযোগস্থল, পুরুষের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ, মহিলাদের ক্ষেত্রে উরুর ভেতরের দিকে ফুলে গেছে তখন প্রাথমিকভাবে এটি হার্নিয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

হার্নিয়া হলো মানব শরীরের পেটের (Abdomen) ভেতরের অনেক অংশ পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে দুর্বল, এসব দুর্বল অংশগুলো খুবই নাজুক অবস্থায় থাকে। যদি কোনো কারণে পেটের অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে আমাদের অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ওই চাপে স্থানচ্যুৎ হয়ে সেই দুর্বল জায়গা দিয়ে প্রবেশ (penetrete) করে ফেলে তখন নাভী, উদর ও উরুর সংযোগস্থল, অণ্ডকোষ ইত্যাদি এলাকা ফুলে ওঠে। এটিই হলো হার্নিয়া।

**কেন পেটের অভ্যন্তরের চাপ বৃদ্ধি পায় :** যদি কাশি বা পুরনো কাশি বেড়ে যায়, হঠাৎ হাঁচি চলে আসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রোস্টেটগ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া, প্রেগনেন্সি বা গর্ভাবস্থা ইত্যাদি। যেসব প্রকারের হার্নিয়া দেখা যায়

ইংগুইনাল হার্নিয়া (Inguinal Hernia) এই ধরনের হার্নিয়ায় অন্ত্রের অংশবিশেষ উদর ও উরুর সংযোগস্থলে ইংগুইনাল রিজিওন দিয়ে প্রবেশ করে। তখন উদর ও উরুর সংযোগস্থল ফোলা মনে হয়।

ইংগুইনো স্ক্রোটাল হার্নিয়া (Inguino-scrotal Hernia) এ ধরনের হার্নিয়া ইংগুইনাল হার্নিয়াতে কোনো ব্যবস্থা না নিলে হয়ে থাকে। তখন অন্ত্রের অংশবিশেষ নামতে নামতে একেবারে অণ্ডকোষে এসে প্রবেশ করে, ফলে অণ্ডথলি ফুলে যায়।

ফিমোরাল হার্নিয়া (Femoral Hernia) ফিমোরাল হার্নিয়া সাধারণত মহিলাদের হয়। এক্ষেত্রে উরুর ভেতরের দিকে স্ফীতি দেখা দেয়।

আম্বিলিকাল হার্নিয়া (Umbilical Hernia) এক্ষেত্রে নাভির চারপাশ বা একপাশ ফুলে ওঠে।

ইনসিসনাল হার্নিয়া (Incisional Hernia) উদরের পূর্বে অপারেশন করা হয়েছে এমন অঞ্চলে ইনসিসনাল হার্নিয়া হয়। কেননা, অপারেশনের ফলে সেই অঞ্চল খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

হার্নিয়ার লক্ষণ কুঁচকি বা অণ্ডথলি ফুলে যাওয়া, নাভির আশপাশ ফুলে যাওয়া, উরুর গোড়ার ভেতর দিক ফুলে যাওয়া, পেটে পূর্বে অপারেশন করা হয়েছে এমন স্থান ফুলে যাওয়া।

জটিলতা ও উপসর্গ প্রচণ্ড ব্যাথা, বমি ভাব, বমি, মল ত্যাগে অসুবিধা, হার্নিয়ার চিকিৎসায় বিলম্ব হলে আটকে যাওয়া, খাদ্য নালীর রক্ত সরবরাহ ব্যাহত করে গ্যাংগ্রিন ঘটাতে পারে, পেরিটোনাইটিস, সেফটিসেমিয়া, শক, এমনকি, মৃত্যুও হতে পারে।

**চিকিৎসা :** এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো সার্জারি। তাই দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। অপচিকিৎসায় জটিলতা বেড়ে যায়।

*[সূত্র : দৈনিক মানবজমিন]*

## হাত-পায়ে 'ঝিঁঝি' ধরা

হাতে বা পায়ে 'ঝিঁঝি ধরা' খুবই কমন বিষয়। সব মানুষেরই এমনটি হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণত হাত বা পায়ের ওপর লম্বা সময় ধরে চাপ পড়লে

সাময়িক যে অবশতা অনুভূতি তৈরি হয় সেটিকেই আমরা 'ঝিঁঝি ধরা' বলে থাকি। এই উপসর্গটিকে মেডিকেল পরিভাষায় 'টেম্পোরারি প্যারেসথেসিয়া'ও বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এটিকে 'পিনস অ্যান্ড নিডলস'ও বলা হয়। শরীরের যে অংশে ঝিঁঝি ধরে, সেখানে সাময়িক অসাড় এবং পাশাপাশি এমন একটি অনুভূতির তৈরি হয় যেন অসংখ্য সুঁই দিয়ে একসঙ্গে ঐ অংশে খোঁচা দেয়া হচ্ছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড়তা এবং খোঁচা লাগার মতো অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে যায়।

**যেভাবে ঝিঁঝি ধরে বা অনুভূত হয় :** মানুষের হাত বা পায়ে ঝিঁঝি ধরার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় দীর্ঘক্ষণ বসা বা শোয়ার কারণে। আবার বিভিন্ন কারণে দীর্ঘসময় ঝিঁঝি ধরার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের বা ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় কোনো একটি অঙ্গে অসাড়তা অনুভব করার ঘটনা ঘটতে পারে। মেরুদণ্ডের আঘাতজনিত সমস্যা থেকে 'সার্ভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিস' বা 'লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস'-এর ক্ষেত্রে হাতে-পায়ে ঝিঁঝি ধরার আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া হাতে বা পায়ে রক্ত সঞ্চালন কমে গেলে 'পেরিফেরাল আর্টারাল ডিজিজ' হিসেবে ঝিঁঝি ধরতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে শরীরের ঐ অংশে রক্ত প্রবাহ কমে যাওয়ায় মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে ঝিঁঝি ধরে থাকে। ডায়াবেটিসের কারণে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি নামক একটি রোগ হয়, যার কারণে হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে। সাধারণত মানুষের হাত বা পায়ে ঝিঁঝি ধরার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ঝিঁঝি ধরার অনুভূতিটা কিছুটা রহস্যজনক মনে হলেও এর পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিন্তু খুবই সহজ। আমাদের দেহের সবখানেই অসংখ্য স্নায়ু রয়েছে যেগুলো মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য অংশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে থাকে।

বসা বা শোয়ার সময় সেসব স্নায়ুর কোনো একটিতে চাপ পড়লে দেহের ঐ অংশে রক্ত চলাচলকারী শিরার ওপরও চাপ পড়ে। ফলে শরীরের ঐ অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এর ফলে ঝিঁঝি ধরতে পারে। 'ঝিঁঝি ধরা' অনুভূতিটিকে তিন ধাপে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত চাপ প্রয়োগ হওয়ার মিনিটখানেক পর তিন থেকে চার মিনিটের জন্য স্থায়ী হওয়া অস্বস্তিকর অনুভূতি, যেটিকে 'কমপ্রেশন টিঙ্গলিং' বলা হয়। এই অনুভূতিকে অনেকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন, তাদের 'চামড়ার ভেতরের অংশে পিপড়া দৌড়াদৌড়ি করে।' দ্বিতীয় ধাপটি সাধারণত শুরু হয় দশ মিনিট পর। এই ধাপে হাতে বা পায়ে অসাড়তা বোধ হয় এবং যতক্ষণ স্নায়ুর ওপর চাপ থাকে ততক্ষণ এই অনুভূতি থাকে। তৃতীয় ও শেষ ধাপটি শুরু হয় চাপ অপসারণ করার পর। সাধারণত প্রথম দুই ধাপের তুলনায় এই ধাপটি অপেক্ষাকৃত বেশি যন্ত্রণাদায়ক, তবে সাধারণত এই ধাপে যন্ত্রণা বা ব্যথার চেয়ে ভিন্ন ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। তবে কিছুটা ব্যথা বা যন্ত্রণার অনুভূতি থাকলেও তার পুরোটাই শারীরিক। এই অনুভূতি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে গেলেও ঠিক কোন জায়গায় এই অনুভূতির সূচনা হয়েছিল বা কোথায় শেষ হয়, সেটি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না মানুষ। ঝিঁঝি ধরলে সাময়িকভাবে অসাড় হয়ে যাওয়া অঙ্গটি টানটান করে রাখলে সাধারণত কিছুক্ষণের মধ্যে দ্রুত ঐ অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। আবার অস্থায়ী চেতনানাশক ব্যবহারের পর ঝিঁঝি ধরার মতো অনুভূতি তৈরি হয়।

**কারণগুলো :** যেসব ক্ষেত্রে ঝিঁঝি হতে পারে, তা হলো– **১.** কেমোথেরাপির মতো চিকিৎসার ক্ষেত্রে। **২.** এইচআইভি'র ওষুধ, খিঁচুনির ওষুধ বা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে। **৩.** সিসা বা রেডিয়েশনের মতো বিষাক্ত বস্তুর সংস্পর্শে এলে। **৪.** পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের অভাব হলে। **৫.** স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে– বিশেষ করে কোনো অসুস্থতা বা আঘাতের পর। **৬.** অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে। **৭.** বিশেষক্ষেত্রে চেতনানাশক ব্যবহারের পর।

**কখন চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন :** দীর্ঘসময় বা প্রায়ই ঝিঁঝি ধরার মতো উপসর্গ থাকলে বা অস্বস্তি লাগলে। কোনো অঙ্গে নিয়মিত ঝিঁঝি ধরার ঘটনা ঘটলে বা বারবার ঝিঁঝি ধরার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এবং যে কারণে হয় তা অনুধাবন করে নিজে নিজেও সতর্ক হলে। ❑

## الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

# জিজ্ঞাসা ও জবাব

### ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

**রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।**

*(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)*

***জিজ্ঞাসা (০১) : আমরা জানি, হালাল প্রাণীর গোশ্ত রান্না করে খেলে ওযূ নষ্ট হয় না। কিন্তু উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করতে হয় কেন? বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*আশিকুল ইসলাম*
*উত্তর দিনাজপুর, ভারত।*

**জবাব :** উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করতে হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সাহাবী জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বকরির গোশ্ত খেলে কি ওযূ করতে হবে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল : উটের গোশ্ত খেলে কি আমরা ওযূ করব? তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। এ মর্মে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। তাই এর হিকমত কি আছে, তা জানা থাক বা না থাক, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো উটের গোশ্ত খেলে অবশ্যই ওযূ করতে হবে। এটির কোনো কারণ হাদীসে উল্লেখ হয়নি। –আল্লাহু 'আলাম।

***জিজ্ঞাসা (০২) : সালাতে চোখ বন্ধ রাখার হুকুম কি? কেউ চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করলে তার সালাত হবে কি? আশাকরি সঠিক উত্তর পাব।***

*হাফিজ নাঈমুল ইসলাম*
*মীরপুর, ঢাকা।*

**জবাব :** সালাতে সর্বাবস্থায় সাজদার স্থানে দৃষ্টি দিতে হয়। কেবল তাশাহ্হুদের সময় ইশারারত ডান হতের শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, সালাতরত অবস্থায় চোখ বন্ধ করা নিষেধ। –আল্লাহু 'আলাম।

***জিজ্ঞাসা (০৩) : পর পর ০৩ (তিন) জুমু'আহ্ সালাত আদায় না করলে মুসলিম থাকে না –কথাটি কতখানি সত্য? দলিলভিত্তি সঠিক জবাব জানতে চাই।***

*সৈনিক রফিক (অব.)*
*খালিশপুর, খুলনা।*

**জাবাব :** সালাত মু'মিন ও কাফির-এর মাঝে পার্থক্যকারী 'ইবাদত। তাছাড়া জুমু'আর সালাত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি উম্মাতে মুহাম্মাদী'র বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি অলসতাবশত তিন জুমু'আহ্ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন"– *(সুনান আবূ দাঊদ; সুনান আন্ নাসায়ী; জামে' আত্ তিরমিযী)*। অপর বর্ণনায় এসেছে– সাহাবী জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ওজর ছাড়া তিন জুমু'আহ্ ছেড়ে দেবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন"– *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১২১, হাসান)*। তাই এরূপ ব্যক্তিকে তাওবাহ্ করে সালাত আদায় করতে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। নতুবা কুফুরী থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

***জিজ্ঞাসা (০৪) : সালাতে কিরআত পড়ার সময় ৩ বা ৪টি আয়াত পড়ার পর ভুলে গেলে কি অন্য সূরা পড়তে হবে? না রুকূ'তে চলে গেলে হবে?***

*খোরশেদ আলম*
*জিদ্দা, সৌদী আরব।*

**জবাব :** সালাতে সূরা আল ফাতিহার পর কুরআন থেকে কিছু পাঠ করার নির্দেশ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিয়েছেন। আপনার বর্ণনা মতে ৩ বা ৪টি আয়াত পড়ে থাকলে সালাত সুন্নাত মুতাবিক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। তাই অন্য সূরা সংযুক্ত না করে তাকবীর দিয়ে রুকূ'তে গেলেই চলবে। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন।

***জিজ্ঞাসা (০৫) : বর্তমানে ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে সরকার শতকরা ০২ (দুই) টাকা দিয়ে থাকে। এ টাকা খাওয়া কি জায়িয হবে?***

*মামুনুর রাশীদ*
*সিঙ্গাপুর।*

**জবাব :** ব্যাংকের মাধ্যমে লেন-দেন প্রদর্শিত বা সাদা টাকা হয়। আর হুন্ডির মাধ্যমে পাঠালে তা কর ফাঁকির কারণে অপ্রদর্শিত বা কালো টাকা হয়। তাই সরকার জনগণকে বৈধভাবে টাকা লেন-দেন করতে উৎসাহ দিতে

নিজ তহবিল থেকে শতকরা ২ টাকা উপহার দিয়ে থাকে। এ টাকা সুদ নয়: বরং বৈধ। আর বৈধ উপহার গ্রহণে কোনো বাধা নেই।

***জিজ্ঞাসা (০৬) : মা-বাবা লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন। সুদি লোন হারাম, তা তারা জানতেন। এরপরও তারা এ কাজ করেছেন। আমি তাদেরকে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝিয়েছি। কিন্তু তারা শুনেননি। এখন আমার করণীয় কি?***

*আব্দুল হালীম, বীরভুম, ভারত।*

**জবাব :** আপনি কর্মক্ষম হলে মা-বাবার এ সুদি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বসবাস করবেন। তবে মা-বাবার খিদমত কখনও ভুলে যাবেন না। তাদের প্রয়োজনে টাকা-পয়সা খরচ করা এবং তাদের সেবা নিশ্চিত করা আপনার উপর ফর্‌য। পক্ষান্তরে আপনি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধি হন, তাহলে নিরুপায় হয়ে আপনি মা-বাবা'র সাথেই থাকবেন। এ ক্ষেত্রে আপনি দায়ী হবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "একের বোঝা অন্যের উপর চাপিও না।" আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো!"

***জিজ্ঞাসা (০৭) : অবৈধভাবে যে হারাম সন্তান হয়, তার দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে এবং সে কি পরবর্তীতে বিবাহ হলে (অবৈধকারী নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হলে) তার দায়িত্ব কি ঐ পিতা বহন করবে?***

*তাইবুর রহমান*
*উত্তরা, ঢাকা।*

**জাবাব :** অবৈধ সন্তান দু'ধরনের- এক. বিবাহিত মহিলা ব্যভিচার করায় যে সন্তান জন্ম হবে, তার সম্পর্ক ঐ মহিলার স্বামীর প্রতি বর্তাবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» অর্থাৎ- বিবাহিত স্ত্রীর অবৈধ সন্তানটির সম্পর্ক ওই মহিলার স্বামীর দিকে সম্বন্ধ হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮১৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৫৮)* দুই. অবিবাহিত দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে যে সন্তান হবে তার সম্পর্ক তার মায়ের দিকে হবে। তবে এ ঘটনার পর যদি ঐ ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহলে পিতার ঘরেই লালিত-পালিত হবে। কিন্তু পিতার সম্পত্তিতে সে ওয়ারিস হবে না।

***জিজ্ঞাসা (০৮) : তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাই। এ মর্মে সহীহুল বুখারী'র একটি হাদীস উল্লেখ্য করে বাধিত করবেন।***

*হারুন ভুঁইয়া*
*মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

**জবাব :** তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত পড়তে রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি জুমু'আর দিনে এসে মসজিদে বসে পড়লে রাসূল (ﷺ) তাকে উঠিয়ে ২ রাকআত সালাত পড়িয়েছিলেন। তাছাড়া সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে ২ রাকআত সালাত আদায় না করে যেন না বসে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৬৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৭১৪)*

***জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি ঋণগ্রস্ত। আবার চাকরিও পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় কোন দু'আ বেশি বেশি পড়ব? দয়া করে জানাবেন।***

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*সরাইল, বি-বাড়িয়া।*

**জবাব :** রুজি-রুটির মালিক আল্লাহ তা'আলা। ঋণগ্রস্ততা একটি কঠিন পরীক্ষা। আবার এদিকে চাকরিও নেই। তাই আপনি বেশি বেশি করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করুন : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. "হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।" আর চাকরির সন্ধান করুন এবং মহান আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকুন। আশাকারি আল্লাহ তা'আলা আপনার একটা বিহিত করবেন।

***জিজ্ঞাসা (১০) : পাপ করে যারা তা বলে বেড়ায় এবং বেপরোয়া থাকে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে ইসলাম কি বলে? দয়া করে একটু বলবেন কি?***

*আবু আব্দুল্লাহ*
*সাভার, ঢাকা।*

**জবাব :** পাপ করে দ্রুত অনুশোচনা করা ঈমানের দাবি। পক্ষান্তরে পাপ করে জনগণের কাছে বলে বেড়ানো গুরুতর অপরাধ। এরূপ ব্যক্তি মহান আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মাত সবাই ক্ষমা পাবে, তবে পাপ প্রকাশকারী ব্যক্তি ক্ষমা পাবে না। আর পাপ প্রকাশকারী বলতে বুঝায়– লোকটি রাতে কোনো পাপ করে, যা আল্লাহ তা'আলা গোপন করে রেখেছেন; অথচ সে সকালে বলে বেড়ায়– হে অমুক! আমি গতরাতে এরূপ এরূপ কাজ করেছি। *(সহীহুল বুখারী)* ❑

প্রচ্ছদ রচনা

# ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল সাক্ষী মাসজিদ ক্বিবলাতাইন

–আবু ফাইয়ায

মহানবী (ﷺ)-এর মনের তীব্র বাসনা, জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মাকদিম নয়; বরং বায়তুল্লাহ বা কা'বা হবে তার ক্বিবলা। বারংবার উর্ধ্বাকাশে মনোনিবেশ করে তিনি দয়াময় মহান আল্লাহর কাছে স্বীয় ইচ্ছার ব্যক্ত করেন। এবার আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের তামান্না পূরণ করতে ওয়াহী নাযিল করলেন :

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

"আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ করো। অতএব (সালাতে) তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বাগৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, (সালাতে) সেই (কা'বার) দিকে মুখ ফেরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ (বিধান) তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নয়।"[৬৯]

**আয়াতের সারসংক্ষেপ :** মদিনা 'কুরআন প্রিন্টিং প্রেস' থেকে মুদ্রিত কুরআনুল কারীমের তাফসিরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই রাসূল (ﷺ)-এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন ইসরাঈল বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বায়তুল-মুকাদ্দাসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন ইবরাহিমী ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময় হয়ে গেছে। কা'বা মুসলিমদের ক্বিবলা সাব্যস্ত হোক- এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আন্তরিক বাসনা। তিনি এর জন্য দু'আও করছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না।

এ আয়াতাংশটি হচ্ছে কেবল পরিবর্তন সম্পর্কিত মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি তৃতীয় হিজরীর রজব বা শা'বান মাসে নাযিল হয়। ইবনু সা'আদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দাওয়াত উপলক্ষ্যে উম্মে বিশ্বর ইবনু বারা' ইবনে মা'রুরের ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে সালাতে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'রাকআত সালাত আদায় হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময় তৃতীয় রাকাআতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও তার সাথে জামাআতে শামিল সকল মুসল্লি বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।[৭০]

এরপর মদিনা ও মদিনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারা ইবনু 'আযিব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা এমন অবস্থায় পৌঁছল, যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই সবাই সে অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ খবরটি কুবায় পৌঁছল পরের দিন ফজরের সালাতের সময়। লোকেরা এক রাকআত সালাত শেষ করেছিল, এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছল, 'সাবধান! ক্বিবলা বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে ক্বিবলা নির্দিষ্ট হয়েছে। এ কথা শোনার সাথে সাথেই জামা'আতের সকল মুসল্লি কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।[৭১]

হিজরতের পূর্বে মক্কা-মুকাররামায় যখন সালাত ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই সালাতের জন্য ক্বিবলা ছিল, না বায়তুল-মাকদিস ছিল; এ প্রশ্নে সাহাবী ও

[৬৯] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৪৪।*

[৭০] *তাবাকাতে ইবনু সা'দ : ১/২৪২।*

[৭১] *অনুরূপ বর্ণনা, সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৮৬।*

তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) বলেন, ইসলামের শুরু থেকেই ক্বিবলা ছিল বায়তুল-মাকদিস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মাকদিসই ক্বিবলা ছিল। এরপর কা'বাকে ক্বিবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, যাতে কা'বা ও বায়তুল-মাকদিস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভব ছিল না।

তাই তার মনে ক্বিবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন, মক্কায় সালাত ফরয হওয়ার সময় কা'বাগৃহই ছিল মুসলিমদের প্রাথমিক ক্বিবলা। কেননা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালাম-এর ক্বিবলাও তাই ছিল। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় অবস্থানকালে কাবাগৃহের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর তার ক্বিবলা বায়তুল-মাকদিস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। এরপর প্রথম ক্বিবলা অর্থাৎ- কাবাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ নাযিল হয়।

**মসজিদ পরিচিতি :** মাসজিদে ক্বিবলাতাইন ইসলামের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল সাক্ষী। পবিত্র মদিনাতুল মুনাউওয়ারার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মাসজিদে ক্বিবলাতাইন ইসলামী যুগের তৃতীয় মাসজিদ। আর সর্বপ্রথম মানব পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত অসংখ্য নাবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর ক্বিবলা ছিল একটি, আর তা হলো– "বায়তুল মাকদিস"। কিন্তু রহমাতুল্লিল 'আলামিন, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সৌভাগ্যবান উম্মাতের একাংশের ভাগ্যে বায়তুল মাকদিস ও পৃথিবীর প্রথম ঘর মাসজিদুল হারাম, এই উভয় ক্বিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায়ের বিরল সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।

**'মাসজিদ ক্বিবলাতাইন' নামকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :** এই মাসজিদটি বানু সালামাহ্ অঞ্চলে হওয়ার সুবাদে এর প্রথম নাম ছিল মাসজিদে বানু সালামাহ্। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিযরত করার পর প্রায় ১৬ মাস বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে মহান রাব্বুল 'আলামিন পবিত্র কা'বাকে মুসলিমদের জন্য চিরস্থায়ী ক্বিবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। যা আজও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিমের ক্বিবলা তথা অন্তরের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত। সব জাতি, গোত্র এবং সব ধর্মের একটি বিশেষ নিদর্শন বা প্রতীক থাকে, যার অনুপস্থিতিতে সে জাতি ও গোত্রের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হতে পারে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সালাতের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্বিবলা নির্ধারণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী হওয়ার সুবাদে মিল্লাতে ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠার জন্য কা'বার দিকে মুখ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর মুসলিমদের ক্বিবলা বাইতুল মাকদিস হওয়ার কারণে কপট হৃদয়ের ইয়াহূদীরাও এই বলে অপপ্রচার করে বেড়াত যে, আমাদের ও মুসলিমদের ক্বিবলা যেহেতু এক ও অভিন্ন, অতএব ধর্মের ক্ষেত্রেও মুসলিমদের উচিত আমাদেরই অনুসরণ করা। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা ছিল, কা'বা যদি মুসলিমদের ক্বিবলা হতো!

এ বাসনা তীব্রতর হলে তিনি ব্যাকুল নয়নে আকাশের দিকে বারবার তাকাতে থাকেন, অহীর প্রত্যাশায়। হিজরী দ্বিতীয় সনের শা'বান মাসে মতান্তরে রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামসহ বিশিষ্ট সাহাবী বিশ্র ইবনু বারা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর নিমন্ত্রণে যোগ দিতে মদীনার অদূরে মাসজিদে বানু সালামায় পৌঁছে যোহরের সালাত, মতান্তরে 'আসরের সালাত আদায়ের জন্য তাশরিফ নিলেন। বলা বাহুল্য, সালাতে ইমাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর মুক্তাদি ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)-গণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআতের মাঝামাঝি সময়ে মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আন্তরিক ইচ্ছার বাস্তবায়নে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। "হে মুহাম্মদ! আপনি নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরান এবং (মুসলিমগণ)

তোমরা যেখানেই থাকো, সে দিকেই নিজেদের মুখ ফেরাবে।"

মহান আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) চার রাকা'আতবিশিষ্ট সালাতের দুই রাকআত কা'বা তথা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরে আদায় করেছিলেন, বিধায় এ মাসজিদ ইসলামের ইতিহাসে মাসজিদে ক্বিবলাতাইন বা দুই ক্বিবলা বিশিষ্ট মাসজিদ নামে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

**মাসজিদে ক্বিবলাতাইনের নির্মাণ-ইতিহাস :** দ্বিতীয় হিজরী মোতাবিক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারার বানু সালামাহ্ অঞ্চলের খালিদ ইবনু ওয়ালিদ সড়কসংলগ্ন এ মাসজিদ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবা কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নির্মাণ করেন। অতঃপর কিংবদন্তী ন্যায়পরায়ণ শাসক, দ্বিতীয় 'উমার নামে খ্যাত খলিফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) ১০০ হিজরীতে মাসজিদে ক্বিবলাতাইন পুনঃনির্মাণ করেন। এর দীর্ঘকাল পর মাসজিদে নববীর প্রখ্যাত খাদিম শুজায়ি শাহিন আল জামালি ৮৯৩ হিজরীতে ছাদসহ "মাসজিদে ক্বিবলাতাইন" পুনঃনির্মাণ করেন। এই নির্মাণের ৫৭ বছর পর তুরস্কের 'উসমানীয় খলিফা সুলাইমান আল কানুনি ৯৫০ হিজরীতে আগের তুলনায় বৃহৎ আয়তনে মাসজিদ ক্বিবলাতাইন পুনঃনির্মাণ করেন।

**অনন্য বৈশিষ্ট্য :** এ মাসজিদ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যা অন্য কোনো মাসজিদে নেই। তা হলো– রাসূলূল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মসজিদে দু'টি মেহরাব তথা ইমামের দাঁড়ানোর স্থান ছিল। যার একটি বায়তুল মাকদাসমুখী। অন্যটি ছিল কা'বাঘরমুখী। পরে সংস্কারের সময় বায়তুল মাকদাসমুখী মিম্বরটি গুঁড়িয়ে দিয়ে কা'বাঘরমুখী মেহরাবটি অবশিষ্ট রাখা হয়।

**মাসজিদের আয়তন ও মুসল্লি ধারণক্ষমতা :** ঐতিহ্যবাহী আরবীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এ ঐতিহাসিক মাসজিদের মুসল্লি ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার। মাসজিদটির আয়তন তিন হাজার ৯২০ স্কয়ারমিটার। গম্বুজসংখ্যা দু'টি, ব্যাস আট মিটার ও সাত মিটার। উচ্চতা ১৭ মিটার। মিনারসংখ্যা দু'টি। ইসলামের সোনালী ইতিহাসে "মাসজিদে ক্বিবলাতাইন"-এর আবেদন চিরভাস্বর। ❑

## বিবদমান দু'জনের মাঝে মীমাংসার প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতি (সপ্তাহ) সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয়। যে আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যার সাথে তার ভাইয়ের দুশ্মনী, মনোমালিন্য ও বিবাদ রয়েছে। (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) বলা হয়– তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। *সহীহ্ মুসলিম- মা: শা:, হা: ৩৫/২৫৬৫।*

## ঝগড়া-বিতর্ক এড়িয়ে চলার প্রতিদান জান্নাত

(এক) আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাতিলের পক্ষে বিতর্ক করা ছেড়ে দেয় তার জন্য জান্নাতের একপ্রান্তে ঘর নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি হক্বের পক্ষে বিতর্কে জড়ানোর পর তা থেকে ফিরে আসে তার জন্য জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে ঘর নির্মাণ করা হয়। আর যে তার চরিত্রকে উত্তমপন্থায় গড়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়। জামি' আত্ তিরমিযী- মা: শা:, হা: ১৯৯৩।

(দুই) আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একপ্রান্তে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ্-বিবাদ বর্জন করে চলে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে উপহাস ছলেও মিথ্যা বর্জন করে চলে। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। *সুনান আবূ দাউদ-মা: শা:, হা: ৪৮০০ (হাসান)।*